ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১০ সংখ্যা ।। ১৫ কার্তিক, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২ নভেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

হিন্দু ভাবাবেগকে কাজে না লাগানোতেই পরাজয় ঃ তোগাড়িয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হিন্দু সেন্টিমেন্টকে ভোটের বাক্সে টেনে আনতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই সাম্প্রতিক তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এই মন্তব্য করেছেন বিশ্ব

হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। গত ২৪ অক্টোবর রাজধানী নতুন দিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রবীণভাই ওই মন্তব্য করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা জনমনে কমে যাওয়াও বিফলতার অন্যতম কারণ। যদি কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহলে তা বজায় রাখার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করতে হবে।

শ্রী তোগাড়িয়া আরও বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক দলই প্রামাণিকতার ভিত্তিতে হিন্দু ভাবাবেগকে ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত করতে পারে। তবে ডাঃ তোগাড়িয়া আলাদাভাবে কোনও নেতার নাম নেননি। হিন্দু ভাবাবেগ যে ভোটের

(এরপর ৪ পাতায়)

ওসি অপহরণ

বুদ্ধ-মাওবাদীদের গোপন আঁতাত

গূঢ়পুরুষ ।। পশ্চিম মেদিনীপুরের সাঁকরাইল থানায় মাওবাদীদের ঝটিকা হানা, থানার ওসিকে অপহরণ এবং ৫৬ ঘন্টা পরে সাংবাদিকদের মধ্যস্থতায় তাঁর মুক্তি — সব মিলিয়ে একটা জমজমাট নাটক। মেগাহিট টিভি ধারাবাহিক। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেই দিয়েছেন যে সবটাই সি পি এমের সাজানো নাটক। মমতার মন্তব্য হয়তো অতি কথন। কিন্তু এই 'ওসি অপহরণ' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ ও কিছু ঘটনা যে কষ্টকল্পিত অবিশ্বাস্য তাতে সন্দেহ নেই। তাই প্রশ্ন উঠেছে এবং ভবিষ্যতে উঠবে। যেমন, মাওবাদীরা গুরুত্বহীন এমন একটি থানা তাদের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিল যেখানে মাত্র ৬টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের রাইফেল ও ৩টি পিস্তল থাকে। এইসব আগ্নেয়াস্ত্র শেষ কবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা থানার বড়বাবুরও জানা নেই। থানার মালখানায় তালাবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। এইসব অকেজো আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ করতে মাওবাদীরা এতটা তৎপরতা দেখাল কেন? বলা হচ্ছে, সংবাদমাধ্যমের প্রচার পেতে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ অভিযান বন্ধ করার জন্য জনমত গড়তে।

বিশ্বাস হয় না। প্রচার ও যৌথ অভিযান বন্ধই যদি লক্ষ্য হয় তবে মাওবাদীরা থানায় ঢুকেই বিনা প্ররোচনায় দুইজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করে খুন করবে কেন? মাওবাদীরা যখন সাঁকরাইল থানায় হানা দেয় তখন সেখানে ছিলেন ১৩ জন কনস্টেবল, ৫ জন হোমগার্ড, ৩ জন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্য এবং ৩ জন সাব ইন্সপেক্টার। এঁরা সকলেই তখন ছিলেন ঘরের পোশাকে এবং নিরস্ত্র। নিহত মেজবাবু এবং ছোটবাবুর মৃত অবস্থার ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। ছবিতে স্পষ্ট যে তাঁরা থানায় লুঙ্গি পরে ডিউটি করছিলেন। তাই হানাদারদের বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। এমনকী থানার ও সি অতীন্দ্রনাথ দত্তকে যখন মাওবাদীরা অপহরণ করে তখন তিনিও ঘরোয়া পোশাকে এবং নিরস্ত্র ছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, ঘটনার প্রায় দু'মাস আগে থেকেই অস্ত্রশস্ত্র সবই থানার মালখানায় তালাবন্দি করে রাখা হয়েছিল। থানার কনস্টেবল গৌরাঙ্গ মন্ডল তদন্তকারী গোয়েন্দাদের বলেছেন যে ওইসব রাইফেল নিয়ে ঘোরাফেরার থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকাটা অনেক বেশি নিরাপদ। মাওবাদীদের কোনওরকম বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও কেন তারা অকারণে দুই অফিসারকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে খুন করেছিল তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তারা চাইলে থানার বড়বাবুর সঙ্গে মেজবাবু ও ছোটবাবুকেও অপহরণ করতে পারতো। সেক্ষেত্রে মাও

সমর্থক বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার শর্ত আরও জোরদার হতো। কিন্তু তা হয়নি।

আরও একটা বিষয় চিন্তাশীল পাঠকদের ভাবাবে। তা'হলো কিছু সাংবাদিকদের ভূমিকা। এই সাংবাদিকদের কয়েকজনকে ব্যবহার করে গোয়েন্দা পুলিশ ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেফতার করেছিল। তাই নিয়ে তখন সাংবাদিক মহলে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। মাওবাদী নেতা কিষেণজী ঘোষণা করেছিলেন সাংবাদিকদের একটা বড় অংশ পুলিশের চর। এদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে তথাকথিত সেই 'পুলিশের চর' সাংবাদিকদেরই জামাই আদরে ডেকে কিষেণজী গরম গরম ভাষণ দিয়ে 'যুদ্ধ বন্দি' ওসিকে মুক্তি দিচ্ছে। সাংবাদিকদের একজনও জানতে চাইছেন না কী কারণে থানার দুই নিরস্ত্র প্রতিরোধহীন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। না, চিত্রনাট্যে সাংবাদিকদের মুখে পরিচালক প্রযোজকরা সংলাপ বসাননি। বসালে, নাটকের অতিসরলীকরণটা ধরা পড়ে যেত। হয়তো কোনও 'বোকা সাংবাদিক' ফস্ করে প্রশ্ন করতে পারতেন যে মাওবাদী নেতা সোমেন, গৌর চক্রবর্তী বা ছত্রধরের মুক্তি না চেয়ে জঙ্গলমহলের হতদরিদ্র আদিবাসী মহিলাদের মুক্তির দাবী কেন করা হচ্ছে। হয়তো বা কেউ জানতে চাইতেন ৩ মাস আগে অপহৃত দুই পুলিশ কনস্টেবল কাঞ্চন গড়াই ও সাবির মোল্লার খবর। এইসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠতে পারে বলেই চিত্রনাট্য থেকে সাংবাদিকদের সংলাপ বর্ণনা করা হয়। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে যে সব টিভি সাংবাদিকদের বেছে বেছে কিষেণজী তলব করেছিলেন পরবর্তীকালে তাদের একনজকেও বিনা বিচারে এতকাল জেলবন্দি আদিবাসী মহিলাদের বক্তব্য ক্যামেরায় ধরতে দেখিনি। অথচ সৎ সাংবাদিকতার প্রয়োজনে ফুলমণি, আয়না, পদ্মমণি, সুনিয়াদের মতো ধৃত ১৫ জন আদিবাসী মহিলাদের বক্তব্যও যথেষ্ট জরুরী ছিল। জানা যেত ওসি অপহরণ নাটকের নেপথ্য ঘটনা। মার্কস মাও- মাসতুতো ভাইদের গোপন সম্পর্ক।

মার্কসবাদী এবং মাওবাদী কম্যুনিস্টরা কতটা পরস্পরের বন্ধু বা কতটা শত্রু সে ব্যাপারে যথেষ্ট ধোঁয়াশা আছে। একদা আমাদের এই মার্কসবাদী নেতারা নেপালের মাওবাদীদের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নেপাল থেকে চীনপন্থী মাওবাদীরা পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদীদের অস্ত্র ও অর্থের যোগান দিত। এবং তা রাজ্যের বামফ্রন্ট প্রশাসনের জ্ঞাতসারে। তখন মার্কস-মাওরা ভাই ভাই ছিল। সম্প্রতি মাওরা মার্কসদের বিরুদ্ধে বন্দুকের নল ঘুরিয়েছে। তাই মাওবাদীদের খতম করতে যৌথ অভিযান। অনেকটা শিয়া-সুন্নীদের লড়াইয়ের মতো। একটা হাস্যকর নাটকীয় লড়াই বা শত্রুতা। ভুললে চলবে না যে

(এরপর ৪ পাতায়)

ইসকনের জমি কাড়লেন রেজ্জাক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বৈদিক ভিলেজ নামে বড়লোকদের প্রমোদ কানন নির্মাণের জন্য গরীব চাষীদের কাছ থেকে বেআইনি জমি দখলে রাজকিশোর মোদীকে পূর্ণ মদত দিয়েছেন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। কিন্তু মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ইসকনের (ইন্টারন্যাশনাল কৃষ্ণ কনসাসনেস) জমি কেড়ে নিয়েছেন তিনি। সিলিং বহির্ভূত জমি রাখার ধুয়ো তুলে ভগবান কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের এত বড় প্রকল্প আটকে দিয়েছিলেন এই রেজ্জাক মোল্লা। আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর বর্তমান সদস্যরা এখানে ভব্য এই কৃষ্ণ উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কয়েকশো কোটি টাকা বিনিয়োগ হোত, তা সিপিএম তথা রেজ্জাক মোল্লার সহ্য হয়নি। একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে এখানে তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের বাসনা ছিল ইসকনের। জমি কেনা নিয়ে বিতর্ক তুলে অযাচিতভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, ইসকন বেআইনিভাবে সিলিং অতিরিক্ত জমি কিনেছে। এনিয়ে অবশ্য এখনও পর্যন্ত মায়াপুরের কোনও গ্রামবাসী কোনও প্রতিবাদ জানায়নি। পুলিশে ইসকনের বিরুদ্ধে কেউ জোর করে জমি কেনার অভিযোগও জানায়নি। বরং বিদেশী পর্যটক আগমনের কথা ভেবে স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলেন। বাজার দরে তা কিনে নিয়েছিল ইসকন কর্তৃপক্ষ। ফোর্ডের কর্তারা তাঁদের প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের কাছে জমাও দেয়। কিন্তু

রেজ্জাক মোল্লা

এর মধ্যেই বাধ সাধে রেজ্জাক মোল্লা। তিনি প্রকল্পটি আটকেছেন। যদিও মাফিয়া লাগিয়ে রাজারহাট ভাঙড়ের গরীব চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়াকে পূর্ণ মদত দিয়েছেন তিনি। রাজকিশোর মোদীরা মাফিয়া লাগিয়ে জমি কিনে নিলেও, তা আবার তাদেরই ফেরত

(এরপর ৪ পাতায়)

ফায়দা লুটছেন সংসদীয় কমিটির সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লোকসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটির তিনজন সদস্যের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে যে দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত।

ওই তিন সাংসদের প্যানেলই দেশে মেডিকেল এডুকেশন, প্রাইভেট মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারি সংস্থা 'মেডিকেল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া'-র বিভিন্ন নিয়ম-নীতি স্থির করেন। এই তিনজন হলেন, কংগ্রেস দলের ওয়ার্ধার সাংসদ দত্ত রাঘবজী মেঘে, বিজেপি'র প্রভাকর খোড়ে এবং সংযুক্ত জনতা দলের এম এ এম রামস্বামী। খোড়ে এবং রামস্বামী কর্ণাটক থেকে রাজ্যসভার সাংসদ।

এঘটনার আগেও একই ধরনের বিভ্রান্তি এবং অভিযোগ উঠেছিল অন্য এক সংসদীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিরুদ্ধে। পার্লামেন্টস্ কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিং-এর ক্ষেত্রেও তিনজন সাংসদের স্বার্থ জড়িত থাকার কথা উঠেছে। তাঁরা জাতীয় সড়ক তৈরির কাজের সঙ্গে সংযুক্ত। ওই কমিটির ক্ষমতা রয়েছে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে অথরিটির কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার। ঘটনাচক্রে হাইওয়ে অথরিটি হাজার হাজার কোটি টাকার সড়ক প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

কমিটির চেয়ারম্যান ডি কিশোরচন্দ্র রেড্ডি সি ও পি ইউ (কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিং)-র সদস্য টি সাবিরামি রেড্ডি এবং লাগাডাপতি রাজাগোপালকে উদ্ভূত বিতর্কিত স্বার্থ বিষয়ে জবাবদিহি করতে বলেছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ওয়ার্ধার কংগ্রেসী সাংসদ দত্ত রাঘবজী মেঘে রাধিকাবাই মেঘে মেমোরিয়াল মেডিকেল ট্রাস্ট এর সভাপতি। ওই ট্রাস্টই 'দত্ত মেঘে মেডিক্যাল সায়েন্সস্ ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালায়। মেঘে নিজেই ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলর।

দত্ত মেঘেমেডিকেল কলেজের রয়েছে ডীমড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটাস। ট্রাস্ট আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম — রবি নায়ার ফিজিওথেরাপি কলেজ, রাধিকাবাই মেঘে

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

হিন্দু 'রিজওয়ানুর' খুন কাশ্মীর পুলিশের হাতে : নিশ্চুপ সংবাদমাধ্যম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ফের রিজওয়ানুর কান্ডের ছায়া। তবে এবার আর পশ্চিমবঙ্গে নয়, কাশ্মীরে। খলনায়কের ভূমিকায় কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারের পরিবর্তে কাশ্মীর পুলিশের মুন্সিবাগ পুলিশ স্টেশন। তবে সেই 'রিজওয়ানুর কান্ড'র মতো সংবাদপত্রের শিরোনামে বা নিউজ চ্যানেলের হেডলাইনস-এ ছয়লাপ হয়ে যায়নি এহেন খবরটি। এর কারণ সম্ভবত একটাই। সেই 'রিজওয়ানুর' ছিলেন মুসলিম আর এই 'রিজওয়ানুর' হলেন 'হিন্দু'। সেই 'রিজওয়ানুর' বিয়ে করতে চেয়েছিলেন হিন্দু প্রিয়াঙ্কা টোডীকে। এবং এই 'রিজওয়ানুর' বিয়ে করেছিলেন মুসলিম আমিনা ইউসুফকে। এই নয়া 'রিজওয়ানুরের' নাম হলো রজনীশ শর্মা।

২৯ বছর বয়সী জম্মুর রজনীশের সঙ্গে গত ২১ আগস্ট শ্রীনগরের বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সী আমিনা ইউসুফের বিয়ে হয়। আমিনা এবং রজনীশ-এর মধ্যে গত পাঁচ বছর চেনা-জানা ছিল এবং সেই সূত্রেই বিয়ে। বিয়ের আগেই আমিনা হিন্দু হন, নাম হয় আঁচল শর্মা। এক মুসলমানীর এতটা স্পর্ধা বরদাস্ত করতে পারেনি তার বাবা-মা। আমিনা ওরফে আঁচল শর্মা আরও একটা মারাত্মক অভিযোগ হেনেছেন তাঁর বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেছেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বাবা-মা পুলিশকে দিয়ে ভাসুর পবনের বাড়িতে রজনীশের খোঁজে তল্লাশি চালায়। রজনীশকে প্রথমে না পেয়ে তাঁদের চোখ পড়ে আঁচলের দিকে। ভয়ে পালাতে যান আঁচল। কিন্তু আচমকা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয় তাঁর গর্ভজাত-র।

আঁচলের অভিযোগ তাঁর বাবা মহম্মদ ইউসুফ এবং দুই-ভাই-এর প্ররোচনায় গ্রেপ্তার হন তাঁর স্বামী রজনীশ শর্মা। রজনীশের দাদা পবনের বক্তব্য, " ২১ আগস্ট আঁচলের সঙ্গে বিয়ে করে রজনীশ ২৯ তারিখে আমার রিহরি-র বাড়িতে আসে। সে আমাকে বলে তার এই বিয়ে আমিনা ওরফে আঁচলের বাড়ির লোকেরা একদমই মানতে পারছেনা, উল্টে প্রচন্ড বিরোধিতা করছে। এর মাসখানেক বাদে গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাত দেড়টার সময় পুলিশ আমার বাড়ি রজনীশকে খুঁজতে আসে। আমি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে কাটিয়ে দিতে চাইলেও পুলিশ আমার ভাই-

আঁচল শর্মা (আমিনা) প্রেস কনফারেন্স করে তাঁর স্বামী রজনীশ শর্মার পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সি বি আই তদন্ত দাবী করছেন। (ইনসেটে রজনীশ শর্মা)

কে গ্রেপ্তার করে।"

এরপর সপ্তাহখানেক মুন্সিবাগ থানায় অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয় রজনীশের ওপরে। গত ৬ অক্টোবর পুলিশ কাস্টাডিতে মাঝরাতে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। পুরো ব্যাপারটাই শেষ অবধি চেপে যাবার একটা মরিয়া চেষ্টা চালায় কাশ্মীর পুলিশ। কিন্তু রজনীশের বাড়ির লোকের আন্দোলনের ফলে সমগ্র ঘটনাটি সামনে আসে।

যাই হোক, এই ঘটনাটি কিন্তু একটা বড় সামাজিক প্রেক্ষিতকে অকস্মাৎ সামনে নিয়ে এসেছে। আমিনা নিজের মুখেই বলেছেন, "আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করা থেকে রজনীশকে বিয়ে— সবই করেছি স্বেচ্ছায়। এর জন্য কেউ আমার ওপর জোর খাটায়নি। বরঞ্চ আমিই রজনীশকে আমায় বিয়ে করার জন্য চাপ দিয়েছি।" তাঁর এই বক্তব্যের পরেও কোনও নারীবাদী তো দূরের কথা, জাতীয় মহিলা কমিশন বা রাজ্য মহিলা কমিশনের কোনও সদস্যাকে এগিয়ে আসতে বা কোনও উচ্চ-বাচ্য করতে দেখা যায়নি। পেট্রো ডলারের অপার মহিমায় সংবাদমাধ্যমগুলোও মুখে কুলুপ এঁটেছে। হিন্দু ও মুসলিম — এই ফ্যাক্টর দু'টো খুব জোরালোভাবে কাজ করেছে পশ্চিমবঙ্গে-র রিজওয়ানুর-প্রিয়াঙ্কা ও কাশ্মীরের রজনীশ-আমিনা (আঁচল) কান্ডে। রজনীশ পত্নী আঁচল তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর পুলিশকে দায়ী করা সত্ত্বেও এব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই, না রাজ্য প্রশাসনের না কেন্দ্রীয় সরকারের।

লাখ কেন, বোধহয় কোটি টাকার প্রশ্নটা ভাসছে শ্রীনগরের আকাশে-বাতাসে — এই কি তবে একটা (তথাকথিত) ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নমুনা?

এই সময়

শিয়া সংরক্ষণ

মুসলিমদের শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভায় সংরক্ষণের সরাসরি দাবী জানাল শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় পার্সোনাল ল' বোর্ড। ২৫ অক্টোবর বোর্ডের বাৎসরিক বৈঠকে এই দাবী তোলে তারা। পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি মৌলানা মির্জা মোহঃ অর্থার বলেন, ভারতের ৫ কোটি শিয়া সম্প্রদায়ের হয়ে কথা বলার জন্য এই সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও সনিয়া গান্ধীর কাছে এই মর্মে আবেদনও জানান। লোকসভায় তাদের আসন পাকা করতেই বোর্ডের এই দাবী। সেই সঙ্গে মন্ত্রীসভাতেও তাদের প্রতিনিধি রাখার দাবী তুলেছে শিয়া সম্প্রদায়ের এই কট্টর সংগঠনটি।

গান্ধীগিরি

মৃত্যুর ছ'দশক পরেও রেহাই পাচ্ছেন না মোহন দাস করমচাঁদ গন্ধী। কারণ তিনি হলেন গিয়ে নিজেই একটা আস্ত ভোটব্যাঙ্ক। সেই কারণে অনেকটা মায়াবতীর মায়াবী ধাঁচেই তাঁর ডান্ডী অভিযানের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারি টাকায় গান্ধীজীর ৬০ ফুট উঁচু ও তাঁর সহযোগীদের মূর্তি স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বাধ সাধলেন তাঁরই পৌত্র তথা ডান্ডী কমিটির চেয়ারম্যান ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। আসল গান্ধীগিরি দেখিয়ে মূর্তি বসানোর যাবতীয় পরিকল্পনায় জল ঢেলে তাঁর বক্তব্য, 'এই মূর্তি বসানোর চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীর মিতব্যয়িতা ও তাঁর নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। তাই এ ধরনের প্রচেষ্টা বাতিল করতে হলো।'

রবীন্দ্র চিন্তা

রবীন্দ্র চিন্তাতেই মিলতে পারে বিশ্ব শান্তি। এমনই অভিমত ইউনেস্কোর। পৃথিবীকে মৈত্রী ও শান্তির পথ দেখাতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। চলতি বছরের ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহী বোর্ডের ১৮০ তম সভায় এই দাবী ওঠে। বিশ্বের ১৬টি দেশ মানুষকে শান্তির পথ দেখাতে রবীন্দ্র ভাবনাকে হাতিয়ার করার দাবী রেখেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে। কবির রচনা দিয়ে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে চাইছে ইউনেস্কো। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচরণ, তাঁর মনন বিশ্ববাসীকে এক নতুন পথের দিশা দেবে — এমনই বিশ্বাস ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহী সভার সদস্যদের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৫ বছরে রবীন্দ্রনাথের ৯৫ শতাংশ রচনা জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কাগজে মন্দা

বিশ্ব আর্থিক মন্দা এবার সরাসরি নিউইয়র্ক টাইমসে। মন্দার হাত থেকে রেহাই পেতে ১০০ সংবাদ কর্মী ছাঁটাই করছে টাইমস। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক বিল কেলার ইতিমধ্যেই এই মর্মে নোটিশ জারি করেছেন। প্রথমে ৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায়, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিল কেলার। গত বছর ১০০ সংবাদ কর্মী ছাটাই করে আমেরিকার এই বিখ্যাত সংবাদ পত্রটি। চলতি বছরে আর্থিক মন্দার হাত থেকে বাঁচতে আবারও কর্মী ছাঁটাই হতে চলেছে।

স্বাস্থ্য চল্লিশা

বিদ্যালয়ে শুধু পঠন-পাঠনই নয়, সরস্বতীর বন্দনা ও স্বাস্থ্য চল্লিশা পাঠ আবশ্যক করছে রাজস্থান। গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে প্রতিটি স্কুলে সরস্বতী বন্দনা। সেই সঙ্গে প্রতিটি পড়ুয়ার জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে স্বাস্থ্য চল্লিশার পাঠ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেও সরস্বতী বন্দনা ও স্বাস্থ্য চল্লিশাকে আবশ্যিক পাঠ্যসূচীর মধ্যে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য চল্লিশার মধ্যে রয়েছে শরীর সুস্থ রাখার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ। সেই সঙ্গে যাতে শরীরকে আরও সুস্থ-সবল রাখা যায়, সে সবেরও বিভিন্ন অনুশীলন এতে রয়েছে। বিদ্যার্থীদের 'স্বাস্থ্য চল্লিশা' নিয়মিত পাঠ করতে হবে। যাতে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ক্লাসের শুরুতেই থাকছে বিদ্যা দেবীর বন্দনা।

আর্থিক সুরাহা

আর্থিক মন্দা থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবে ২০১০ সাল। এমনই মত বিশেষজ্ঞদের। কর্মী ছাঁটাইও কম হবে সামনের বছর। প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা তাদের লগ্নীও বাড়াতে পারবে। মার্সার নামক হিউম্যান রিসোর্স কনসালটিং সংস্থা সমীক্ষায় দেখেছে, গাড়ি, ওষুধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বাড়বে। সেই সঙ্গে বেতন বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে কর্মীদের। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষাতেও এই একই রিপোর্ট উঠে এসেছে।

ঠগ বাছতে

এক বা দুই নয়। একেবারে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা। স্কুলে দেরীতে পৌঁছানোর কঠোর সাজা দিল উত্তরাখন্ড সরকার। স্কুলে গরহাজিরের কারণে ৩০ জন শিক্ষককে সাসপেন্ড করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। সম্প্রতি হঠাৎই বেরিয়ে পড়েন রাজ্যের কিছু নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাল হকিকৎ জানতে। নিজে খুঁতিয়ে দেখেন শিক্ষকদের উপস্থিতির রেজিস্টার। রাজ্যে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে তিনি আবারও স্কুল পরিদর্শন করবেন বলে জানান।

এগিয়ে তারা

কথায় বলে মেয়েদের দৌড় নাকি রান্না ঘর অবধি। এবার বোধ হয় এই ধারণা পাল্টাতে হবে। পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে তারাও সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে চাইছে। এজন্য খবর শোনা, বিভিন্ন চলতি ঘটনার খোঁজ-খবর রাখার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে তাদের মধ্যে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কেরলে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রবণতার হার বেশি। এর কারণ হিসাবে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, চুয়ান্ন শতাংশ মহিলা নিয়মিত খবর শোনেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন আলোচনা চক্রে অংশ নেন তাঁরা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর তারা নিজেদের মতামতও তুলে ধরছেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাইশজনের নিঃশর্ত মুক্তি ঃ ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস

দেশের মানুষ ভুলিতে চাহিলেও এই সিপিএম ও তাহাদের স্বাভাবিক মিত্র কংগ্রেস দল মানুষকে ভুলিতে দিতে চায় নাই সেই কান্দাহারে বিমান অপহরণকাণ্ডের কথা।

ঘরে-বাহিরে তীব্র চাপের মধ্যেও বুদ্ধবাবুর মতো বাজপেয়ী মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সন্ত্রাসবাদীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপোষহীন বাজপেয়ী সরকার তার মন্ত্রীমন্ডলী, নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি, দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিরোধী দলনেতা ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিন শতাধিক নিরীহ মানুষের বিনিময়ে মাত্র পাঁচজনকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধবাবুর সরকার তাঁর মন্ত্রীমন্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করা তো দূরের কথা, বিরোধী দলের সঙ্গেও কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন নাই। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মাত্র একজন ওসির মুক্তির বিনিময়ে বাইশ জন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত জেল-বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ দিশাহারা। তাঁহার কথাবার্তাও হইয়া পড়িয়াছে অসংলগ্ন। তিনি কখনও বলিতেছেন, তিনি তো জেল-বন্দীদের মুক্ত করিয়া দেন নাই। কেবল মাত্র জামিনে আদালত মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আবার কখনও বলিতেছেন, মাওবাদীরাই ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হইল এই জেল বন্দীরা তো ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১ এ, ১২২, ১২৩, ১২৪ এ, ১২০বি ও ৩০৭ নং ধারায় এবং আমর্স অ্যাক্টের ২৫/২৭ নং ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছিল। এইসব ধারাই জামিনযোগ্য নয়। সরকারের তরফে পুনরায় ইহাদের অপরাধ লঘু করিয়া দেখানোয় বিচারক যারপর নাই অবাকও, হইয়াছিলেন। প্রথমে ক্লীনচিট দেওয়ার বিরোধিতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনের চরিত্রই হইল সব কিছুর রাজনীতিকরণ করা। প্রশাসন যেমন দলের অধীন; বিচারপতি নিয়োগও এখানে হয় রাজনীতির আলোকে। তাহা হইলে আর আদালত, বিচারপতি, বিচার বিভাগের কী প্রয়োজন। তাহারা প্রায়শই বলিয়া থাকে যে 'আইন তাহার আপন পথেই চলিবে', আবার কখনও বলে, "আইনের চোখে সকলেই সমান'। কিন্তু দেশের আপামর জনগণ ভালো করিয়াই জানে যে এসবই কথার কথা। আইন যদি আপন পথেই চলিত, তবে কেন সনিয়ার কংগ্রেস দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেই সি বি আই কুয়োত্রোচির বফর্স ঘুষ মামলা চাপিয়া যায়। কিংবা লঘু করিয়া দেখায়, তাই আমরা দেখি নির্বাচন আসিলেই অযোধ্যা মামলার শুনানি শুরু হয়। সেই দাঙ্গায় আক্রান্ত ব্যক্তি, গৃহ বা অন্য ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো হয়;এই যদি গণমাধ্যমের চরিত্র হয়, আদালত ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলির চরিত্র হয়, তাহা হইলে সন্ত্রাসবাদীদের অপহরণ লীলা তো চলিতেই থাকিবে।

কিন্তু ইতিহাস সব কিছুরই নির্মম নীরব সাক্ষী হইয়াই থাকে। শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা। তারপরে ইতিহাস লইয়া থাকে তাহার চরম প্রতিশোধ। ইহাই ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের লইয়া যাহারা রাজনীতি করে, ইতিহাস তাহাদেরও ক্ষমা করে না। কান্দাহার-কাণ্ডকে প্রতি নির্বাচনেই কংগ্রেস ও তাহার স্বাভাবিক মিত্র কমিউনিস্টরা তুলিয়া আনিয়া বিজেপি-কে দোষারোপ করে, কেন বাজপেয়ী সরকার সেদিন কয়েকজন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহা নাকি, তাহাদের মতে, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে চরম আত্মসমর্পণ। আজ কমিউনিস্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় কি করিল? মাত্র একজন পুলিশ অফিসারকে মুক্ত করিতে ২২ জন রাষ্ট্রদ্রোহিতায় বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্ত করিয়া দিল। ইহা কি চরম আত্মসমর্পণ নয়? ইহাকেই বলে ইতিহাসের নির্মম পরিহাস'। 'History repeats itself'.

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রথম ইংরাজ আসিলে তাহার ধোপদুরস্ত সফেদ রঙ দেখিয়াই আমরা মোহিত হইলাম, প্রাণ বিলাইয়া দিলাম। যুগ-যুগান্তরের শ্যামরূপের মোহিনী ভুলিয়া ধবলের কবলে আত্মসমর্পণ করিলাম। 'সাহেব' বলিলেন, "আমরা তোমাদের লেখাপড়া শিখাইয়া বিদ্বান করিব"। আমরা বলিলাম, "যে আজ্ঞে"। তাহার পর একটা ঘোঁট বসিল, তাহাতে জনকতক 'সাহেব' রহিলেন ও জনাকতক মাতাল বাঙালীও রহিলেন। তর্ক এই, আমরা কোন বুলি বলিয়া বিদ্বান হইব। জনকতক সাহেবের মত যে, আমরা যেমন জাতিগত অভ্যাসে ক্যাঁক ক্যাঁক করি, সেই ক্যাঁক ক্যাঁকটাই একটু ভাল করিয়া করিতে শিখি। তাহার পর নিজের ডানা নাড়িয়া কখনও বা মাটির ধান কুড়াগুলি খুঁটিয়া খাই, আর কখনও বা গাছের ফলটা আমটায় ঠোকর মারি। আর জনকতক সাহেবের মত হইল, না আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বলিতে শিখি; পাখির ক্যাঁক ক্যাঁক পাখিই বোঝে, ও ত' স্বাভাবিক, ও তো আর বিদ্যা নয়; বিদ্যা হইল "রাধাকৃষ্ণ" বলা। অধিকাংশ বাঙালী বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের "রাধাকৃষ্ণ" এই বলাও"। তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন ক্যাঁক ক্যাঁক করিলে কোনও লাভ নেই, নিজের ডানায় ভর দিয়া চিরকালটা উড়িয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শিখিলে আমরা দরে বিকাইব। শৌখীন লোক আমাদের কিনিয়া লইবে। চকচকে পিতলের তার ঘেরা খাঁচায় আমাদের বাসা দিবে। পাঁচজনকে ডাকিয়া আমাদের দেখাইবে, বুলি শুনাইবে। সুতরাং ধার্য হইল আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বুলিই শিখিব।

— রসরাজ অমৃতলাল বসু (প্রবন্ধ পরবিদ্যা)

সংখ্যালঘু তোষণ সাম্প্রদায়িকতা তোষণ নয় কি

দেবব্রত চৌধুরী

আজ ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজনীতি নেতাদের এক অদ্ভুৎ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কত সংখ্যালঘুদের তোষণ করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভোটে জিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের তুষ্ট করাই এখন বিশেষ করে কয়েকজন নেতা ও নেত্রী জাতীয় কর্তব্য বা গদী দখলের একমাত্র উপায় বলে মনে করছেন। সম্প্রতি দেশের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী তাঁর জেতার কেন্দ্র জঙ্গিপুরে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এক ক্যাম্পাস্ খুলতে চলেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গিপুরের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার মুসলমান সম্প্রদায়ের তুষ্টিকরণ। কিন্তু উনি ভুলে গেছেন আলিগড় ইউনিভার্সিটি হচ্ছে পাকিস্তানের আঁতুড়ঘর।

প্রণববাবুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার ১৯১৩ সালে বিপিনচন্দ্র পাল 'প্যান ইসলামিজম্' শিরোনামে একটি অসামান্য প্রবন্ধ রচনা করেন। তা থেকে জানা যায় প্যান ইসলামী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে জনৈক জালালুদ্দিন ভারতে আসেন ১৮৮৩ নাগাদ এবং কলকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য সময়কার গণ্যমান্য মুসলমান জননায়কদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই সব আলোচনায় তিনি পরিস্কার ভাষায় বলেন 'Pan-Islamism'', if you will, trancends all consideration of race and class and is of the worldan extra territorial type in which all the Moslem population of merge their geographical identy and become one Million''. সেই সময় বাংলার মুসলিম চিন্তাবিদ ও নেতা সৈয়দ সামসুল হুদার বক্তব্যে জানা যায় — The Moslem think that, they are Moslem first and Indian afterwards.... ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্ব একদিন না একদিন সাফল্যমন্ডিত হবেই। এই আশায় সব মুসলমান ভাইদের উজ্জীবিত হতে বলেন। অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের জাতীয় সংগ্রামের আকাশে এই আন্দোলনের অশনি-সংকেত সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন হতে হুঁসিয়ারী দেন। মুখ্যত পূর্বোক্ত ভাবাদর্শের প্রভাবেই আলিগড় মমুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক স্যার সৈয়দ আহমদের ভাবান্তর ঘটে বলে বিপিনচন্দ্র পালের বিশ্বাস। স্যার সৈয়দ ১৮৭৬ অথবা ১৮৭৭ সালে কলিকাতায় এসেছিলেন; তাকে বাবু প্যারীমোহন ও হরিমোহন রায়ের বাড়িতে সংবর্ধনাও জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে স্যার সৈয়দ হিন্দুস্থানের হিন্দু ও মুসলমানদের একজন মানুষের দুটি চোখ ও দুটি হাত বলে বর্ণনা করেন। জনশ্রুতি যে তিনি এমনও উক্তি করেছিলেন হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই হিন্দু। পরিতাপের বিষয় কয়েক বছর বাদেই সৈয়দ সাহেব এই সব কথা পরিত্যাগ করে বলেন, হিন্দু ও মুসলমান যে জাতিগতভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র শুধু তাই নয় তারা পরস্পর বিবাদমানও বটে। আর একই সাথে তিনি ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর নিকট জানাতে থাকেন প্রার্থনাও। সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি সেই প্রার্থনায় কীভাবে সাড়া দিয়েছিল তাও বর্তমানে ইতিহাস, এই আলিগড়ে দাঁড়িয়েই মুসলিম লীগের একটি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আব্দুর রহিম ঘোষণা করেন ভারতে হিন্দুরা বৃটিশ এবং মুসলমান উভয়েরই শত্রু;যদি ইংরেজ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া মঞ্জুর করে তাহলে মুসলমানরা তাদের সমর্থন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সত্য কথা বলতে কি, হিন্দুদের রাজনৈতিক সমাজ-সাংস্কৃতিক সর্বাধিক প্রভাব খর্ব করা এবং সেইভাবে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করাই প্যান ইসলামিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। বিগত শতাব্দীতে মুসলমান নেতাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ হল অমুসলিম বা অপবিত্র দেশ, মাতৃভূমি নয়। এই মনোভাবের সরকারি স্বীকৃতি মেলে বিংশ শতাব্দীর ১৯১২ সালে অক্টোবর মাসে তৎকালীন গভর্ণরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ শামসুল হুদা একটি প্রতিবেদনে বলেন, "There is a distinction between patrotic feeling of the Hindus and Mohamedans. The Patriotism of a Hindu consits in his love for his country but for the Mohamedans they still look upon India as their land of Adoption. There patriotism is extra territorial. It has its origin in a religious sentiment"। তখনও অর্থাৎ ১৯১২ সালেও মুসলমানগণ ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি না ভেবে দত্তকরূপে গৃহীত দেশ ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। যেমন ভাবে ইংরেজরা ২০০ বৎসর ভারতে বসবাস করেও ভারতকে মাতৃভূমি বলে মানতে পারেনি, দেশের স্বাধীনতার পরে তারা তাদের মাতৃভূমি ইংল্যান্ডেও চলে যায়। কিন্তু মুসলমান বা তারা যে দেশ থেকে এসে ভারত দখল করেছিলো, সেই তুজবেকিস্থান বা তুর্কীস্থানে চলে যায়নি। উল্টে ধর্মের নামে জিগির তুলে ২৩ শতাংশ মুসলিম ধর্ম্মালম্বীদের জন্য ভারত মা'কে দ্বিখন্ডিত করে ভারতের ৩০ শতাংশ জমি নিয়ে মুসলিমদের পবিত্র-স্থান তথা পাকিস্তানের জন্ম দিল। স্বাধীনতা উত্তরযুগে মুসলিম লীগের মুখপত্র 'দৈনিক আজাদ"-এর সম্পাদক মওলানা আক্রাম খাঁ আরব ভূখন্ডকে মানবের আদি মাতৃভূমি বলে উচ্ছ্বসিত হতেন। অথচ ভারতবর্ষকে মা বলে সম্বোধন বা বন্দেমাতরম্ তার নিকট ছিল ইসলাম বিরোধী। বর্তমান কালেও এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটেনি। প্রমাণ দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বোখারির সাম্প্রতিক উচ্চারণ, এতে তিনি ঘোষণা করেন ভারতবর্ষকে তারা অর্থাৎ মুসলমান নবাব, বাদশারা সভ্যতা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য অনেক দিয়েছেন কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন কি? এ সদম্ভ উক্তির মধ্যে ভারতকে স্বদেশ গ্রহণ করার কোনও প্রত্যক্ষ গোচর স্বীকৃতি নেই ।

অনুভব করা যায় ৯০০ বছর আগে আক্রমণকারী মুসলমানদের আগ্রাসী মেজাজ। সেভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা বলত "ভারতবাসী এক অন্য জাতি আমরা তাদের সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছি।"একথা স্বীকার করতেই হয় জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামে সব সময় ঘোষণা করে এসেছে স্বরূপ তো সার্বজনীন, কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপভোগ্য বস্তু নয় অথবা প্রচেষ্টায় লভ্যও নয়। ভারতে বসবাসকারী সমস্ত সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শক্তিতেই স্বরাজ করতে হবে।প্রমাণ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লখনউ চুক্তি (১৯১৬)। যখন অভিন্ন নির্বাচনের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস লীগের শর্তানুযায়ী চুক্তি করে, প্যান ইসলামী খিলাফত, আন্দোলনে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সামিল হওয়া, তার কিছুদিন পরে বঙ্গদেশের লীগ নেতাদের সঙ্গে সি আর দাশের চুক্তি যা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। এই সব চুক্তিগুলি সরকারি প্রতিবেদনে সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের স্বার্থানুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করা হয়। তবুও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখন্ডিত হয়; কিন্তু এই তত্ত্বের যে যুক্তি পরম্পরাগত পরিণতি অর্থাৎ লোক বিনিময় — প্রয়োগিক ক্ষেত্রে তা স্বীকৃত হয়নি অথবা কার্যকর করা হয়নি। ফলে যারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নয় শুধু তারাই নতুন ভারতবর্ষের অধিবাসী হলেন তা নয়, যারা প্যান-ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী এমন অগণিত মানুষও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ভারতে থেকে যায় যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে আত্মপরিচয়ের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করেনি। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় — ভারতবর্ষের অখন্ডতায় বিশ্বাসী জনসমষ্টি এবং অখন্ডতায় বিশ্বাসী নয় (তাদের সংখ্যাও বিপুল) এখন মানুষদের নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু ক্ষমতালোভী নেতারা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো ভারতবর্ষ এক জাতি এক প্রাণ একতা। নেতারা বার বার বলেন ধর্মনিরপেক্ষতা। যার অর্থ কি সমস্ত ধর্মমতের অস্বীকৃতি? এই ধর্মনিরপেক্ষতা কি সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে? সংবিধান প্রণয়ন করার সময় ধর্মনিরেপক্ষতার আদর্শকে সর্বজনীন করার, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দূর করার সম অধিকার-সমস্বার্থ ও সবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করে এক অখন্ড সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল না কি? কিন্তু নিরপেক্ষতার বদলে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে থেকে তোষণ, তাদের ধর্ম বিশ্বাসসম্মত রীতিনীতি সাংস্কৃতিক, কার্যকলাপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার স্বীকৃতি সবই করা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতার হুঙ্কার দিয়ে। সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ! কি স্বার্থপর এদেশের নেতারা অর্থমন্ত্রী প্রণববাবুকে জানাতে চাই যে ভারতবর্ষে হিন্দুরা চিরকালই সহনশীল, উদার। তাই শক, হুন, পাঠান ও মোগল ভারতে ঠাঁই পেয়েছিল। যদি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক হোত তাহলে এই বিদেশ থেকে আগত আক্রমণকারীরা এদেশে থাকতে পারতো না। কিন্তু মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা-হত্যা-নারী ধর্ষণ মন্দির ধ্বংস সর্বোপরি হিন্দুরা অন্ত্যজ ব্রাত্য লিঙ্গপূজক ও ভেড়াপালক বলে ঘোষণা (১৯০৯ সালে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আমির আলি ভারত সচিব মালিক নিকট হিন্দুর সম্বন্ধে স্মারকলিপি পেশ অনুযায়ী) হিন্দুদেরও উত্তেজিত করে তোলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার 'হিন্দু মুসলমান" প্রবন্ধে (শ্রাবণ-১৩৩৮) লিখেছিলেন — "পলিটিকসের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে তালি দেওয়া মিল হতে পারে, সে মিলে আমাদের চিরকালের শান্তি আসবে না। এমন কি পলিটিক্সের এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই। এই ফাঁকির জোড়াটার কাছে বারে বারেই টান পড়বে।

(এরপর ১৪ পাতায়)

জিন্না ফ্যাক্টর ঃ ট্যাকটিকেল ব্লাণ্ডার

শিবপ্রসাদ লোধ

১৯৪৬ সালে ইসলামের নামে পাকিস্তান আদায় করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ শাসিত বাংলার নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে হিন্দু নেতা ও জনগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। গণহত্যা, লুণ্ঠন,গৃহদাহ, নারী ধর্ষণ, জোরপূর্বক গণধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন মওলানা গোলাম সারোয়ার এবং উস্কানিদাতা জিন্না ও সুরাবর্দী। এইসব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর 'সাতচল্লিশের ডায়েরি' গ্রন্থটি যারা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই অনুভব করতে পারছেন তথাকথিত সেকুলার জিন্না ও তার মুসলিম লীগ ধর্মের নামে দেশ ভাগ করতে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকে কত নিপুণ ভাবে মুসলিম জনগণের মাঝে সঞ্চারিত করেছিল। যা দেখে জওহরলাল নেহরুর মতো আগমার্কা সেকুলারও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "There is a Hindu Political India today. Just as they have made Muslim Political India"।

সেই জিন্নাকে ২০০৫ সালে পাকিস্তানে গিয়ে লালকৃষ্ণ আদবানী সেকুলার আখ্যা দিলেন। অতঃপর ২০০৯ সালে যশোবন্ত সিংহ তাকে সেকুলার আখ্যা দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন পথ বেছে নিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের কাছে এধরনের উক্তি খুঁচিয়ে ঘা করার মতোই মনে হয়েছে। এসব করে আদৌ বিজেপির কোনও লাভ হয়েছে কি? এটা হল 'অ্যা ট্যাকটিকেল ব্লান্ডার', যা সংশোধন করা যায় না, শুধু এর ফল ভোগ করতে হয়। দেশভাগের মূল কারিগর জিন্নাকে নিয়ে যখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে মায়াজাল বিস্তার করা হয়, তখন দেশভক্ত মানুষ ধন্দে পড়ে যান। দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বভূমি থেকে চ্যুত, অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার — সব মূল্যহীন হয়ে যায়।

বস্তুত, এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষ, বিদেশী মুষ্ঠিমেয় অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘু মুসলিম শাসকদের দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত ও শোষিত হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে মুসলিম শাসকেরা একদিকে অত্যাচার চালিয়েছে, অপরদিকে ইংরেজের মতো দেশীয় তাঁবেদার বাহিনী তৈরি করে, ধর্মান্তর করে সমর্থক তৈরি করেছে। বস্তুতপক্ষে এই সমর্থকদেরই উত্তরসূরীরা ইংরেজ শাসনকালে মুসলিমদের হাত থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা ইংরেজ অথবা হিন্দুদের হাতে চলে যাওয়ার ভয়ে একদিকে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে, অপরদিকে জিন্নার মতো তথাকথিত সেকুলাররা ইসলামের নামে দেশভাগের জিগির তুলেছে।

ওয়াহাবি-ফরাইজি আন্দোলন, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও দেওবন্দ মাদ্রাসা — এই তিনটির প্রভাবে উপমহাদেশের মুসলিম মানস একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর সন্নিবেশিত হয়েছিল, কিন্তু বহির্ভাগে এর ক্রিয়া ছিল নিস্তরঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মুসলমানদের রাতারাতি জাগিয়ে তুলল— এ বিষয়ে মুসলিম চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তাদিবের ব্যাখ্যা এমন— ''মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাকে রাতারাতি জাগিয়ে দিয়েছিল যে ঘটনাটি, সেটি হচ্ছে ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ...। ১৯১১ সালে দুই বাংলাকে এক করে দেয়। ইংরেজের এই হিন্দু তোষণ নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়।

জিন্না ফ্যাক্টর ও দেশভাগ— ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ ও আগা খাঁর আহ্বানে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯১৩ সালের আগে জিন্না মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বৈতপদ ধরে রাখেন। ১৯১০ সালে তিনি মুসলিম সংরক্ষিত আসন থেকেই ইমপিরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচনে জেতেন। ১৯১৬ সালে অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জিন্নার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস এবং লীগ মিলিতভাবে সংযুক্ত সমিতি স্থাপন করে। চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস-লীগের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবী মেনে নেয়। এর পরিণাম ভয়ানক হয়। কংগ্রেসের পক্ষে এটা ছিল ট্যাকটিকেল ব্লাণ্ডার। চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ক্ষেত্রের দাবী মেনে নেয়। এমন ভয়ানক ভুল কংগ্রেস ও গান্ধীজী মিলে বহুবার করেছেন যা আর শোধরানো যায়নি। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন (১৯৩৮) মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মানতে রাজি না হলে, জিন্না সুভাষ চন্দ্র বসুকে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ১৯২০ সালে জিন্না কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন খিলাফত আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন, তখন জিন্নাসহ বহু মুসলিম নেতা এর ঘোর বিরোধিতা করেন। কারণ হয়তো তাদের ভয় ছিল, মুসলমানরা কংগ্রেসের দিকে

মহম্মদ আলি জিন্না

ঝুঁকে পড়লে তাদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী মার খাবে। ১৯২৪ সালে জিন্নাকে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন। জিন্না প্রেসিডেন্ট হয়েই বললেন, ''হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সেদিন মিটবে যেদিন ভারত বিভাজিত হবে।''

কোকোনদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আরও স্পষ্টভাবে বললেন, ''মুসলমানকে বুঝতে হবে হিন্দু ও ইংরেজ উভয়ের মধ্যে কার সহযোগিতা তুলনামূলক ভাবে প্যান ইসলামিক উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক হবে। ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে কলকাতায় আবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হল। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী রাখল। সে সময় জিন্না সাম্প্রদায়িক স্বার্থে চৌদ্দ দফা দাবী পেশ করলেন। ইংরেজ সরকার এর কিছু মেনেও নেয়। ১৯২৯-এর পর তিনি লণ্ডনে চলে যান। পুনরায় ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে চলে আসেন। ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ লাহোর অধিবেশনে ভারত বিভাজনের দাবী জানান জিন্না। ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই মুম্বাইতে লীগের বিশেষ অধিবেসনে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের দাবী আদায়ের জন্য ১৬ আগস্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ধার্য করা হয়। মুসলমান গুণ্ডারা কলকাতায় নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরপর ১০ অক্টোবর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন নোয়াখালি জেলায় হিন্দু নিধন যজ্ঞ চালালো। লাহোরে শুরু হয় এর আগেই। কাফের-শূন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করতে আগে থেকেই ছক কষা হল। সেসময় মুসলিম লীগের স্লোগান ছিল 'পাকিস্তান কা মতলব ক্যা লাইলাহা ইল্লালাহ'। অথচ জিন্না বন্দেমাতরম্ গীত বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসের ওপর বারবার চাপ সৃষ্টি করলেন। আর বুদ্ধি জীবীদের কাছে তিনি হয়ে যান ধর্মনিরপেক্ষ। এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীনতা আর কিছু হতে পারে? হিন্দু জাতিকে যে তিনি মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন তা 'রিপোর্ট অফ দ্য ভাইসরয় স্টাফ মিটিং-এ এপ্রিল ১৯৪৭-এ প্রকাশ হয়েছে। উক্তিটি এমন— "All Hiddus were subhuman creatures with whom it was impossible to live"।

জিন্নার ধর্মবোধহীনতা ও সেকুলারিত্ব নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়, কিন্তু 'আমরা মুসলমান' জিন্নার এই জাতিগত আবেগই যে দেশভাগের প্রকৃত ভিত্তি একথা নিয়ে সব ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নেতারা নীরব কেন?

দেশভাগ হল অবিভক্ত পাকিস্তানে এথনিক ক্লিনজিং চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানকে হিন্দু, শিখ শূন্য করা হল। উদ্বাস্তু শিবিরে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের ঢল, হাহাকার, নির্মম মৃত্যু।

প্রকৃতপক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না একজন দৃঢ়চেতা, যুক্তিতর্কে সিদ্ধ, কৌশলী, লক্ষ্যে অবিচল নেতা। তিনি নিজস্ব গুণ এবং অবগুণের মধ্যে এমন একটি অন্তরাল সারাজীবন তৈরি করে রাখতে পেরেছিলেন, যা তাঁর বিরোধীদের বারবার প্রতারিত করেছে। অপরদিকে অধিকাংশ গান্ধীবাদী হিন্দু নেতা ছিলেন ক্যালাস। অথচ গান্ধী ছিলেন মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দৃঢ়মূল।

গান্ধীজী রাজনীতি করতে গিয়ে হিন্দুদের বাজি রেখে অহিংসা নিয়ে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করে গেছেন। হিন্দু-মুসলিম যুক্ত জাতীয়তার কথা ঘোষণার তিন বছরের মধ্যেই ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করে। এদেশের রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হোল হিন্দুদের অহিংসা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আরক খাইয়ে নির্জীব জীবে পরিণত করা। তা না হলে ২২ কোটি হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৯ কোটি মুসলমান কি করে ইসলামের নামে দেশকে দু-টুকরো করে ফেলতে পারল। মুসলমানদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

গোটা বাংলাকে গ্রাস করার জন্য জিন্না সুরাবর্দীর চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে যুক্তবঙ্গের দাবীর ধুয়ো তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যদি রুখে না দাঁড়াতেন। আজ বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব থাকতো না। বীর সাভারকর, ডঃ বলিরাম হেডগেওয়ার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের মুছে ফেলার চক্রান্তে সামিল নেতারাই আজ ভারতভাগ্য-বিধাতা। হিন্দুদের মুসলিম নেতারাই ঠিক চিনেছেন, এদের খুব সহজেই কিনে ফেলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা এরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু।

জমি কাড়লেন রেজ্জাক

(১ পাতার পর)

দিয়েছেন রেজ্জাক মোল্লা। কোনওভাবেই মনে হয়নি এমন বেআইনি এবং অনৈতিক কাজ করা সরকারের উচিত নয়। গরীব চাষীদের জমিতে কলকাতার বাবুদের জন্য স্পা-রিসর্ট বানাতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার মনে হয়েছিল, এসব করা হচ্ছে জনস্বার্থে। কিন্তু ইসকনের জন্য জমি নিয়ে তার তীব্র আপত্তি।

সেক্ষেত্রে তাঁর মনে হয়েছে, চাষের জমি সিলিং অতিরিক্ত কাউকে রাখতে দেওয়া উচিত নয়। তাই আসল বৈদিক ভিলেজ যেখানে তৈরি হোত তার জমি আটকে প্রমোদকাননের নামে নকল বৈদিক ভিলেজের জন্য জমি দিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত।

লুটছেন সংসদীয় কমিটির সদস্যরা

(১ পাতার পর)

মেমোরিয়াল কলেজ অফ্ নার্সিং, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং কলেজ অফ্ নার্সিং প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় রয়েছে। বিজেপি'র এম পি কর্ণাটকের প্রভাকর খোড়ে বেলগাঁও-ভিত্তিক লিঙ্গায়েত এডুকেশন সোসাইটির সভাপতি সোসাইটি ছয়টি মেডিকেল কলেজ চালায়। গত ২৫ বছর ধরে খোড়ে ওই সোসাইটির চেয়ারম্যান। লিঙ্গায়েতএডুকেশন সোসাইটি সর্বমোট ২০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। সোসাইটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহারাষ্ট্র এবং রাজধানী দিল্লীতেও রয়েছে। ১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। খোড়ে বেলগাঁও-এর জহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাইয়ে দিয়েছেন। অভিযোগ সত্য হলে এটা নিঃসন্দেহে ক্ষমতার অপব্যবহার। বিদেশে, বিশেষত আমেরিকা ও ইংলন্ডের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মউ' স্বাক্ষর করেছেন। কর্ণাটক লিঙ্গায়েত এডুকেশন সোসাইটির ওয়েবসাইটে খোড়ের যাবতীয় খবরাখবর পাওয়া যাবে।

খোড়ে নিজে অবশ্য সংসদীয় পদের ফায়দা তোলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভালো করার জন্য কাজ করেছেন।

কমিটি অন পাবলিক আন্ডার টেকিং এর প্যানেলভুক্ত এক সদস্য বলেছেন, এই সব অভিযোগ ও অসঙ্গতির বিষয়ে চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ।

হিন্দু ভাবাবেগকে

(১ পাতার পর)

বাক্সে প্রতিফলিত হতে পারে তার উদাহরণ ১৯৯০-৯১ সালে দেখা গিয়েছিল। শ্রীতোগাড়িয়া বলেন, তখন নেতা ও দলের বিষয়ে জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। এই বিশ্বাসযোগ্যতা আসে দৃঢ়তা এবং কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি থেকে। এখন সমস্যা হলো, সেরকম নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাব রয়েছে।

ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্রে এম এন এস ও হরিয়ানায় চৌটালার (আই এন এল ডি) দলের উপস্থিতি স্থানীয় ভাবে নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

গোপন আঁতাত

(১ পাতার পর)

মার্কস বা মাওপন্থী কম্যুনিস্টরা কেউই তত্ত্বগতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তারা আজও সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে লেনিন বা মাও যেভাবে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল বুদ্ধ বাবুদের সঙ্গে কিষেণজীদের পার্থক্যটা হচ্ছে যে মার্কসবাদীরা এখন মুখে আর বিপ্লবের গরম গরম বুলি কপচায় না। কিষেণজীরা কপচায়। মনে রাখতে হবে কম্যুনিস্টদের বিশ্বাস করা যায় না। কম্যুনিস্টরা আগে তোমার হাত ধরে বন্ধুত্ব করবে। পরে কেড়ে নেবে তোমার প্রাণ। তোমার সব কিছু। বুদ্ধ বাবু-কিষেণজীর কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।

রাজ্য রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ-প্রশাসন চরম ব্যর্থ

নিশাকর সোম

পশ্চিম মেদিনীপুরের সাঁকরাইলে থানা আক্রমণ, দুই পুলিশ কর্মীকে হত্যা, ব্যাঙ্ক থেকে ৯-১০ লক্ষ টাকা লুঠ করে মাওবাদীদের এক ভয়ঙ্করতম আক্রমণের ঘটনা ঘটলো।

এ আমরা কোথায় বাস করছি। থানা আক্রমণ, ওসি-কে 'পণবন্দি' করে নিয়ে যাওয়া, আর ব্যাঙ্ক-লুঠ তো বহু জায়গায় হচ্ছে। নপুংসক পুলিশ প্রশাসন! মাওবাদীদের আক্রমণ সম্পর্কে নাকি গোয়েন্দা দপ্তরের আগাম খবর ছিল? তবু ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? আক্রান্ত থানায় আগ্নেয়াস্ত্র নাকি ছিল না? খালি দুর্বল অস্ত্র পড়েছিল। এখন যা ঘটলো এর ফল মারাত্মক হবে। পুলিশবাহিনী আর ঝুঁকি নিতে চাইবে না। এই পরিণতির কারণ — সিপিএম-এর ঘোষণা "আমরা রাজনৈতিকভাবে মাওবাদীদের মোকাবিলা করবো" — অক্ষমের ঘোষণা। ক্ষিতিবাবুরা মাওবাদীদের বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে, আর এস পি তো নকশালপন্থীদের নিয়ে "বৃহত্তর বাম ঐক্য" গড়তে চলেছে।

মমতা ব্যানার্জি ছত্রধর-এর মুক্তি চান, যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার চান। ধর্মতলার অবস্থানে বিরোধী নেতা পার্থ চ্যাটার্জি বলেছেন — "মাওবাদী সিপিএম"-দের গ্রেপ্তার করা হোক। তার একদিন আগে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবী নিয়ে পার্থ চ্যাটার্জি, স্বর্ণকমল সাহা, অশোক দেব প্রমুখরা অবস্থান করেন। তারপর গ্রেপ্তার, ধস্তাধস্তি— মহাকরণে মহারণ। ধন্য রাজ্য প্রশাসন — ধন্য যুযুধান শক্তিগুলি। এঁরা দেশ ও দশের মঙ্গল করবেন?

রাজ্য রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করার আগে — অন্য দু'টি ঘটনার উল্লেখ করছি— (১) কালীপুজো এবং দীপাবলী-তে এবার এ রাজ্যে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য চরমে উঠেছিল। কলকাতার পুলিশ দেখালো তারা কত অসহায়। এখানে কয়েকটা প্রশ্ন উঠে আসে — (১) ১২০ ডেসিবেল শব্দবাজি লাখে লাখে তৈরি হয়ে থাকে চাম্পাহাটি এবং নুঙ্গিতে। এখান থেকেই এ-রাজ্যের পাশের রাজ্যে রপ্তানি হয়। সেসব রাজ্যে শব্দ দূষণের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এদেশে শব্দদূষণ সম্বন্ধে কোনও জাতীয় নীতি নেই। সেটা হবে না কেন?

(২) দিনের পর দিন — মাসের পর মাস ধরে ১২০ ডেসিবেল অথবা তার বেশি শক্তির বাজি তৈরি হচ্ছে। পুলিশ কি করেন? তাঁরা কি "পুজো বোনাস"- এর সুলুক সন্ধান পেয়ে যান?

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা'হল "দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার পর বিসর্জনের মিছিল-এর তামসিকতা। বিসর্জনের মিছিলে নর-নারী থাকেন। থাকুন। তবে দেখা যায় — মাথায় আবির মেখে নর-নারী দ্বৈত লাস্য নৃত্য করে চলেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তা আটকে থাকে — পরিবহন আটকে থাকে।

আজ যদি হিন্দু ধর্ম বাঁচাতে হয় তবে পূজার পর এই লাস্য-নৃত্য বন্ধ করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হবে এই নিন্দনীয় ঘটনার বিরুদ্ধে।

> **"এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন অসহায়, ব্যর্থ। থানার ভেতর ঢুকে পুলিশকে মারছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গিয়ে মার খাচ্ছে। ধন্য পুলিশ — ধন্য পুলিশ প্রশাসন, ধন্য এই প্রশাসনের প্রধান পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য!"**

দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে আজ "থিম" পূজা — মন্ডপ পূজার হিড়িক লেগে গেছে।

এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন অসহায়, ব্যর্থ। থানার ভেতর ঢুকে পুলিশকে মারছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গিয়ে মার খাচ্ছে। ধন্য পুলিশ — ধন্য পুলিশ প্রশাসন, ধন্য এই প্রশাসনের প্রধান পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য! পুলিশ ব্যর্থ তাই তো সিপিএম-এর রাজ্য সদর দপ্তরের বৃদ্ধ কর্মী হত্যার কোনও কিনারা হয় না, তাইতো "হারিয়ে-যাওয়া" মনীষার খোঁজ মেলে না?

আর একটি ঘটনা — জাল কিটের মামলার কি হল? ধামাচাপা পড়ে গেল? কেন? বিরোধী দলগুলি এ ব্যাপারে নীরব কেন?

এবার আসা যাক রাজনীতির কিস্‌সাতে। সম্প্রতি এক জনসভাতে সিপিএমের দু'জন পরাজিত সাংসদ মহঃ সেলিম ও অনিল বসু, শ্রমমন্ত্রী অনাদি সাহু এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখদের মুখ থেকে বেরিয়েছে — "তৃণমূল বড় হয়েছে — বড় গর্ত করতে হবে"। কেন? গর্তে চাপা দেবার জন্য? যাদের নির্বাচনে পরাজিত করার শক্তি নেই — তাঁদের বিরুদ্ধে মূঢ় আস্ফালন কেন? আবার এও বলা হল "পুলিশকে তিন দিন সময়।" বলা হল "দমদম দাওয়াই দাও।" এ সমস্ত সুভাষিতাবলী(?) বক্তৃতা।

এইসব "নেতা"(?)-দের বক্তৃতা শুনে মনে প্রশ্ন জাগে এই বক্তৃতার কোরামিন দিয়ে মুমূর্ষু পার্টি কর্মীদের কি চাঙ্গা করা যাবে? উল্টে পার্টি কর্মীরা আর মার খেতে রাজি হবে কি? লজ্জা করা উচিত তিন দশকের বেশি রাজত্ব করার পর সিপিএম-এর রাজত্বে শ'য়ে শ'য়ে সিপিএম কর্মী মার খাচ্ছে কেন? এটা কি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া?

যে বক্তাদের কথা উল্লেখ করলাম তাঁরা সব আই এস আই মার্কা কমিউনিস্ট। তাঁদেরকে বিনীতভাবে জানাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট এম আই কালিনিন-এর "অন-কমিউনিস্ট এডুকেশন" বইটি পড়তে। এখন এই বইটা পাওয়া যায় না? মহঃ সেলিম তো কেষ্টবিষ্টু, তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এই বইটা দেখুন। কাদের কাছে, কোন সময়ে, কি জন্য কিভাবে বক্তৃতা করতে হয় তা রাশিয়ার এই কমিউনিস্ট নেতা সুন্দরভাবে বলেছেন। কাদের বলছি একথা? যাঁরা কমরেডদের বলেন 'ডু নট রিড মার্কস, রিড পার্টি লেটার''। এইসব হাঙ্গামা প্ররোচক বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের এক বক্তৃতার উল্লেখ করছি—

"দেহের সমস্ত রক্ত মুখে সঞ্চারিত হলে, তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে না।" (শিক্ষার বিকিরণ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) শুনেছি মহঃ সেলিম দর্শন-এর ছাত্র। ভাল কথা — তাঁকে প্লেটো সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল-এর উক্তিটা স্মরণ করাতে চাই — " তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন তরবারি দিয়ে নয় — তাঁর জ্ঞান দিয়ে।" দার্শনিক রাসেল দাম্ভিক ও আগ্নিস্রাবী ছিলেন। তবে তিনি সাম্যবাদকে গ্রহণ করেননি। অতীশ দীপঙ্কর জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন — গৃহযুদ্ধে আগুন জ্বালার প্ররোচনা দেননি। মহঃ সেলিমকে পার্টির মুখপাত্র করা হয়েছে — যাতে পার্টি সম্বন্ধে ভুল বক্তব্য হাজির না হয়। কারণ বিমান বসুর বক্তৃতাকে বন্ধ করার জন্য বুদ্ধ দেববাবুর দাবীতে তিনি মুখপাত্র হয়েছেন। সরে যাওয়া জনগণকে পার্টির দিকে টানার কোনও প্রভাবী বক্তব্য রাখার ক্ষমতা এইসব নেতাদের নেই। মগজে মানি-মাস্‌ল-ম্যান ঠেসে আছে। একদিকে যেমন পার্টি কর্মীদের কড়া ডোজের স্পিরিট সূচক বক্তৃতা দিয়ে স্পিরিটেড করার ব্যর্থ প্রয়াস চলছে — অপরদিকে নেতাদের

(এরপর ৬ পাতায়)

অ রকম

ডায়াল এ রিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ফোন করলে অ্যাম্বুলেন্স আসে। ঘরের দুয়ারে দমকলও পৌঁছায়। আবার ফোন করলে নামি-দামি কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভও পৌঁছে যায়। কিন্তু রিক্সা পৌঁছায় কি? অন্যত্র পৌঁছায় কি না জানা নেই। তবে পাঞ্জাবের ফাজিল্কাতে এমনটা অবাস্তব নয়। ফোন করলেই ফোনকারীর কাছে পৌঁছে যায় রিক্সাচালক। প্রয়োজন হলে বহু রিক্সাও পাওয়া যবে শুধুমাত্র একটা ফোনের বিনিময়ে। জরুরি পরিষেবার তালিকায় ফাজিল্কাবাসীরা তাই রিক্সাকেও ধরে। ঘরের অন্যান্য জরুরি ফোন নম্বরের তালিকায় থাকে রিক্সা ডাকার ফোন নম্বরটাও। অদ্ভুত না হলেও, এই বিচিত্র পরিষেবার একটা নামও আছে। 'ডায়াল এ রিক্সা' অর্থাৎ রিক্সার জন্য ডায়াল করলেই পাওয়া যাবে এক বা একাধিক রিক্সা। (০১৬৩৮) ৫১০০৬১-এ ফোন করে বাড়ির ঠিকানা বলে দিলেই কোনও না কোনও রিক্সাচালক পৌঁছে যাবে সঠিক ঠিকানায়।

পাঞ্জাবের ফাজিল্কা শহর ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের লাগোয়া শহর। সীমান্ত থেকে দূরত্ব মাত্র ১১ কিলোমিটারের। অবশ্য ফাজিল্কার অধিবাসীরা কখনও এই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কখনও কোনও সমস্যাও হয়নি। রিক্সা আগেও পাওয়া যেত। কিন্তু তা এতটা ব্যবস্থিত মতো ছিল না। আই আই টি-র পড়ুয়ারা শহরে দুটি প্রোজেক্ট চালু করে। তার মধ্যে 'ডায়াল এ রিক্সা' অন্যতম। রিক্সাচালকদের একত্রিত করে তাঁরাই গড়ে তোলেন এই প্রোজেক্ট। এতে ফাজিল্কাবাসীরা যেমন উপকৃত হয়েছেন, অন্যদিকে রিক্সা চালকদেরও একটি স্থায়ী উপার্জনের পথ বের হয়েছে। স্থানীয় মানুষেরাও এই পরিষেবাকে 'পরিবেশ বান্ধব' বলে। রিক্সাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে বিভিন্ন বিমা পরিষেবা।

ডায়াল-এ রিক্সা প্রজেক্টের রিক্সা চালকেরা।

'ডায়াল এ রিক্সা' শুধু আই আই টি-র ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এলাকার মানুষও আজ এর সুফল পাচ্ছে। ফাজিল্কার এই অংশে কোনও গাড়ি চলে না, কার ফ্রি জোন। এই জোনে রিক্সা-ই পরিবেশ বান্ধব। তারাই দূষণ থেকে বাঁচাচ্ছে পরিবেশকে, মানুষকে।

মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন জিয়াউর রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি ।। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী আর্টিলারী মহিউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি তার দেওয়া জবানবন্দিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্ব এবং পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছে। উল্লেখিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত সৈয়দ ফারুক এবং সুলতান শাহরিয়ার রশিদের ব্যাপারে জিয়াউর রহমান কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে সে। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার ধারণা যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান জড়িত ছিলেন এবং সে জন্যই জিয়া ফারুক রহমান ও শাহরিয়ার রশিদের ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন।

জবানবন্দিতে সে আরও বলেছে, সেইসময় সেনাবাহিনীর বিপরীতে রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল সরকারের বাজেট কমানোর উদ্দেশ্যে। তাই সেনাবাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ঠিক করা হয়েছিল, শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে আটক করে রেসকোর্স অথবা গণভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আটক রাখার পর তাঁকে চাপ দেওয়া হবে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করার জন্য। যদি তিনি এতে সম্মত না হন তবে বিচারের মুখোমুখি করা ছাড়াও খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠন করা হবে নতুন সরকার। গঠিত সেই সরকার হবে এক ইসলামিক সরকার। এরপরই সৈয়দ ফারুক তাদের সকলকে দায়িত্ব বন্টন করে দেয় বলে জবানবন্দিতে জানিয়েছে সে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার আগের রাতে ক্যান্টনমেন্টের বালুঘাটে জমায়েত সেনা সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় এই কথাগুলি বলেছে ফারুক রহমান। সম্প্রতি ফারুক রহমানকে উদ্ধৃত করে মহিউদ্দিন আর্টিলারীর দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এই তথ্য হাইকোর্টের রায়ের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। গতকাল আপিল শুনানির চতুর্থ দিন পেপার বুক পাঠ অব্যাহত রয়েছে। বিচারপতি রাহুল আমিনের দেওয়া হাইকোর্টের রায়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও এই মামলায় বিভক্ত রায় প্রদানকারী হাইকোর্টের অপর বিচারপতি এ বি হকের রায়ের পর্যালোচনার অংশ উপস্থাপন শুরু হয়েছে। আসামী পক্ষের কৌঁসুলি ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন তা আদালতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পেপারবুকের ৯৮৪ থেকে ১১৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করেছেন। এছাড়াও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামী ফারুক রহমানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও রায়ে সংযোজিত হয়েছে। জবানবন্দিতে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে নিয়োজিত থাকাকালে ঘটা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি আওয়ামিলীগ নেতাদের উপর বিরক্ত ছিলেন। রায়ের তথ্য হিসেবে ফারুক রহমানের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে বাকশাল গঠন করে জেলা গভর্ণর নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন মেজর রশিদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্টে এনে দেশে এ ধরনের পরিবর্তন না আনার জন্য রাজি করাতে হবে। এ নিয়ে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলোচনাও হয়। তিনিই বলেছিলেন এ ব্যাপারে তার করার কিছুই নেই। যদি কিছু করা যায় তবে তা করারও অনুমতি প্রদান করেন তিনি। তারপর রশিদের সঙ্গে জিয়ার এই অভিমত নিয়ে আলোচনা হয়। রশিদই বলেছিলেন, এটা একটা রাজনৈতিক বিষয় এবং এ নিয়ে ভাবতে হবে না। বিষয়টি তিনিই দেখবেন। পরবর্তীকালে জিয়াউল হক এবং খন্দকার মোশতাকের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় নিম্ন আদালত ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। নিম্ন আদালতের বিচারপতি রাহুল আমিন আসামীদের দেওয়া জবানবন্দি এবং সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে ১০ জনের ফাঁসির রায় বহাল রাখেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী আর্টিলারী মহিউদ্দিনের দেওয়া জবানবন্দিকে আমল না দিয়ে উক্ত মামলা থেকে মুক্ত করে দেন। তবে অন্য বিচারপতি এবিএম খায়রুল মহিউদ্দিনের জবানবন্দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। গত ৯ অক্টোবর পেপারবুক থেকে বিচারপতি খায়রুলের দেওয়া রায়ের প্রথম পর্যালোচনা অংশ উপস্থাপন করেন বিচারপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন। প্রসঙ্গত, এই অংশে মামলার এজাহার, আসামীদের রিমান্ড এবং তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর দেওয়া বিভিন্ন পর্যালোচনা রয়েছে। রায়ের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামীর জবানবন্দি আইনগতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৬ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও দেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বিচারপতি রাহুল আমিনের রায় পাঠ করা পর্ব সমাপ্ত করার পর বিচারপতি এবিএম খায়রুলের দেওয়া হাইকোর্টের রায় উপস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, আসামী সৈয়দ ফারুক রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমেদ আর্টিলারীর দেওয়া জবানবন্দিতে মুজিব হত্যায় জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার বিষয়টিই উঠে এসেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচলে জলবিদ্যুতের বিশাল সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আবার অরুণাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ী নদী। সেই নদীর জলপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সেজন্য নদীতে বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাধার নির্মাণেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শুধু অরুণাচলেই বার্ষিক ৫৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিক্রি করে রাজ্যের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৯,৯০০ কোটি টাকা।

রাজ্যে ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে ১০৩টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হবে। সেজন্য দেশের কয়েকটি বড় মাপের শিল্পসংস্থার সঙ্গে 'মউ' বা চুক্তিস্বাক্ষর রাজ্যের পক্ষ থেকে হয়ে গেছে। আগামী দশবছরের মধ্যে প্রথম দফায় মোট ত্রিশ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। প্রতি মেগাওয়াট বাবদ বাৎসরিক আয় হবে সাত লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে আগামী দশ বছরের মধ্যেই অরুণাচল প্রদেশ সরকার আয় করবে বাৎসরিক ২১০০ কোটি টাকা। মোট ১০৩টি প্রকল্পের মধ্যে রাজ্যের এলাকা হিসেবে রয়েছে — সিয়াং, সুবনসিরি, কামেং এবং লোহিত-এর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই সবকটি প্রকল্পই আকারে বেশ বড়ো। বাদবাকী ২৭ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, তৃণমূলস্তরে অনুসন্ধান চলছে। সবকটি প্রকল্প চালু হতে সময় লাগবে। আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে টার্গেট পূরণের লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার কোমর বেঁধে কাজে নেমেছে।

অরুণাচল প্রদেশের ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নেমে আসা জলের একাংশ তিব্বতের দিকে এবং বাকীটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে যায়। বর্ষা স্বাভাবিক থাকলে প্রদেশে বছরের আট মাস ধরে পনের'শ থেকে তিন হাজার সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। প্রকৃতিপ্রদত্ত এই বিশাল জলরাশিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সারা বছরই অসমসহ সাতটি রাজ্যের মানুষ ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতিতে ভোগেন। সবকটি প্রকল্প চালু হলে সেই সমস্যার সমাধান হতে আর সময় লাগবে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তৎপরতার ফলে কাজ এগিয়ে চলেছে। উল্টোদিকে নানা মহলে প্রতিবাদ ও আপত্তিও উঠছে — কায়েমী স্বার্থের কারণে। কিছু পরিবেশবিদ্‌ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অজুহাত তুলেছেন। এজন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকও চিন্তিত। বিরুদ্ধ বাদীদের অভিযোগ — প্রকল্পগুলি কার্যকরী হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বাংলাদেশের জনগণ বিপদে পড়তে পারেন। এদিকে মণিপুরের বরাক নদীর উদ্‌গমস্থলে তিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে মণিপুরে এসে সরেজমিনে তিপাইমুখ পরিদর্শন করে গেছেন। তিপাইমুখ নিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হাসিনা সরকারের বিরোধীপক্ষ জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে। এনিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি সম্প্রতি ভারত সফর করে গেছেন। বি বি সি-র মতো কতিপয় ভারত-বিরোধী সংবাদ মাধ্যম বেশ সক্রিয়। অথচ এই সংবাদ মাধ্যম-এর কর্তা-ব্যক্তিরা বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সে বিষয়ে প্রায় নীরব। রাজ্যের এই প্রচেষ্টার পাশে কেন্দ্র সরকার কি করে তাই এখন দেখার।

পুলিশ-প্রশাসন চরম ব্যর্থ

(৫ পাতার পর)

নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাহায্য বাড়াতে বলা হচ্ছে!

পার্টির নীচের তলার কর্মীদের অবস্থা নিয়ে কলকাতা জেলা পার্টি কর্মশালা করেছে। সেখানে তলার চেহারাটার আসল রূপটা ফুটে উঠেছে। পার্টির ৫০ শতাংশ কর্মী নিষ্ক্রিয়। পার্টির মধ্যে তোলাবাজি, ঔদ্ধত্য, ধাপ্পাবাজি দেখা দিয়েছে। কেন? এখন বলা হচ্ছে পার্টির নীচের তলার কর্মীদের মধ্যে অ-কমিউনিস্ট সুলভ আচরণ দেখা গেছে। নীচের তলার কর্মীদের বক্তব্য — উপর থেকেই এই আচরণ শিখেছি।

এখন নীচের তলার কোনও কর্মী ব্যবসা করতে নামলে অথবা গাড়ি-ট্রাক কিনলে অর্থের উৎস জানাতে হবে। অথচ কোনও মন্ত্রী দশ লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট-এর মালিক। কি করে টাকা পেলেন? স্ত্রীর চশমার তো হাজার হাজার টাকায় দাম সরকারি তহবিল থেকে আদায়? ক্লাসিক ৫৫৫ সিগারেট খাওয়া নেতা কি বিড়ি টানা কর্মীর বিচার করবেন? আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখাও — একথা নীচের তলার সিপিএম পার্টি কর্মীদের আওয়াজ। নেতারা না বদলালে কর্মীরা বদলাবে না।

অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার কোর কমিটির সভা করলেন। নানান প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিরণময় নন্দের সঙ্গে জলাজমি নিয়ে বিতর্ক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থার কথা জানালেন। যথারীতি কোর কমিটির সভার কথা কাগজে বেরিয়েছে। এখন থেকে কোর কমিটির সভার পর একটা প্রেস নোট প্রকাশ করলে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে। আসলে বুদ্ধদেববাবু সহকর্মীদের আর বিশ্বাস করতে পারছেন না, সহকর্মীরাও তাঁকে আর মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে দেখতে ইচ্ছুক নন। মন্ত্রিসভার সিপিআই দলের মন্ত্রীর সঙ্গে বুদ্ধ বাবুর "ইগো"-এর লড়াই হচ্ছে। একথা তো বাস্তব যে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য রাজনীতিতে এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে বুদ্ধ বাবুর থেকে অনেক অনেক আগের নেতা। প্রমোদ দাশগুপ্তের আমলে ১৯৬১-তে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদে প্রমোদ দাশগুপ্তদের প্যানেলে নন্দ ভট্টাচার্য আর গুরুদাস দাশগুপ্তের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল। কাজেই নন্দবাবুর ঘ্যাম থাকবেই। বস্তুত নন্দবাবুই আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই কে নিয়ে মিনি বামফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন। ধীরে ধীরে বামফ্রন্টের ছোট দলগুলিও সিপিএম তথা বুদ্ধ-বিমান বিরোধী হয়ে উঠছে। এর ফলাফল ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাবে।

বিরোধী কোন্দলেই বাজিমাত কংগ্রেসের

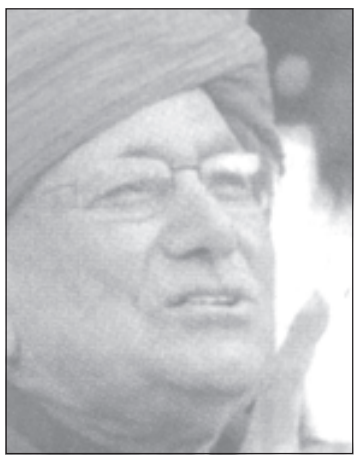

ওমপ্রকাশ চৌটালা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভোটের সময় এমন বিরোধীপক্ষ পেলে জেতার জন্য কংগ্রেসের আর মিত্রপক্ষের দরকার হবে না। দেশের রাজনৈতিক মহলের টাটকা রসিকতা, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী জোটের ভাইরাস বোধ হয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে। এবং এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের যা গতিক তাতে আগামী পাঁচ বছরে এই ভাইরাসের যে প্রতিষেধক বেরোবে তার ন্যূনতম কোনও লক্ষ্মণ চোখে পড়ছে না। বলা বাহুল্য, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং অরুণাচল — এই তিন রাজ্যে সাম্প্রতিক ভোটে বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়েছে স্রেফ দলীয় কোন্দলের জেরে।

এতদিন পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটত, এবারে ভোটে মহারাষ্ট্রে ঠিক তাই ঘটেছে। সেখানে কংগ্রেস ও এন সি পি-র প্রাপ্ত মোট আসন ১৪৪টি। তারা ভোট পেয়েছে ৩৭.৪ শতাংশ হারে। এবারে শিবসেনা ও বিজেপি দু'জনে মিলে ৯০টি আসন পেয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ৩০.৩ শতাংশ। কিন্তু শিবসেনা-বিজেপি জোটের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে বাল ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্রের নবনির্মাণ সেনা। রাজের দল ৫.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৩টি আসন দখল করে ফেলেছে মহারাষ্ট্র বিধানসভায়। সেখানে ভোটের ফলে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গত ২০০৪-এ বিধানসভার যে ভোট মহারাষ্ট্রে হয়েছিল তার তুলনায় কিন্তু কংগ্রেসের ভোট বাড়েনি, বরঞ্চ তাদের জোটসঙ্গী এনসিপি-র ভোট কমে গিয়েছে প্রায় ২.৪ শতাংশ। মজার ব্যাপার হলো, বিজেপি-র পক্ষে ভোটের হার গতবারের তুলনায় প্রায় ০.৩ শতাংশ বেড়েছে, কিন্তু এক ধাক্কায় আসন কমে গিয়েছে ৮টি। এদিকে কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের পারসেনটেজ না বাড়লেও আসন বেড়েছে এক লহমায় ১৩টা। শিবসেনার ভোটের পারসেনটেজ কমেছে, আসনও কমেছে। তার একটা বড় কারণ বাল ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরে। যে মারাঠা জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে একদা উঠে এসেছিলেন বাল ঠাকরে, আজ সেই পথেই কাকাকে নাজেহাল করে ছাড়ছেন রাজ। তবে এর পেছনে 'আমচি মুম্বই, মুই মুম্বইকর' ফ্যাক্টর যতনা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে পারিবারিক কোন্দল। বাল ঠাকরের উত্তরসূরী কে হবেন অর্থাৎ শিবসেনার কর্তৃত্বভার কার ওপরে ভবিষ্যতে বর্তাবে — তাঁর ছেলে উদ্ধব না ভাইপো রাজ? এই প্রশ্নের মুখে বিভাজন হয়ে পড়ে শিবসেনা শিবির। বাল ঠাকরের নিজের ছেলের প্রতি কিছুটা হলেও পক্ষপাতমূলক আচরণ রাজকে দল ছাড়তে বাধ্য করেন। অনেকটা 'misguided patriot' (পথভ্রষ্ট দেশপ্রেমিক)-এর মতো আচরণ করে রাজ নিজের নাক কেটে শিবসেনার যাত্রাভঙ্গ করলেন। শিবসেনার গতবারে পাওয়া ৬২টি আসন এবার কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪টিতে। শতাংশের হিসেবেও গতবারের তুলনায় এবার প্রায় ৪ শতাংশ ভোট কমেছে শিবসেনার। তাই সব মিলিয়ে এই জিনিসটাই দাঁড়াচ্ছে, সর্বমোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেবে খুব একটা ফারাক নেই শাসক কংগ্রেস-এনসিপি জোট এবং বিরোধী বিজেপি-শিবসেনা জোটের। কিন্তু প্রাপ্ত আসন সংখ্যার হিসেবে এই ফারাকটাই আকাশ-পাতাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেমনটা বরাবর হয়ে এসেছে ২০০৯-এর আগে এরাজ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

গত দশ বছর একের পর এক প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কৃষকদের মৃত্যুমিছিল, সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এবার এমনিতেই বেকায়দায় ছিল কংগ্রেস। তারপর তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাই গোষ্ঠীকোন্দল কংগ্রেসেরও ছিল। কিন্তু নির্বাচনী স্ট্রাটেজী এবং নির্বাচনী কূটকৌশল নামক দু'খানি বুদ্ধি তাদের মস্তিষ্কে ছিল। আর এই দুটো জিনিসে বিরোধীপক্ষের প্রচুর খামতি ছিল। সেইসাথে কংগ্রেস ও এনসিপির হাতে তোষণের মাধ্যমে পাওয়া বড় ধরনের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কও ছিল। যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ক্ষমতায় ফিরেছে কংগ্রেস ও এনসিপি জোট পরিচালিত সরকার। তবে মহারাষ্ট্রের কুর্সির দাবিদার এখন বিস্তর। নারায়ণ রাণে, মানিকরাও ঠাকরে, সুশীলকুমার সিন্ধে, বিলাসরাও দেশমুখ, অশোক চহ্বান-কে নেই সেই মেগা-ওপেরায়!

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা ভোটের ফলাফলের পর নিজের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি 'রেকর্ড করেছেন ওই রাজ্যের ইতিহাসে। কারণ একমাত্র '৭২ সালে বংশীলাল-কে বাদ দিয়ে আর কেউই সেখানে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরতে পারেননি। ওই রাজ্যে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি-র এহেন ঐতিহ্য এবার কাজ করেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। গত বিধানসভা ভোটের তুলনায় সেখানে কংগ্রেসের ভোটের পারসেনটেজ কমেছে প্রায় সাড়ে সাত শতাংশ। আসনও কমেছে ২৭টি-র মতো। তবুও কংগ্রেস একপ্রকার হরিয়ানার মসনদ দখল করেই নিয়েছে। কারণ এর পেছনে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর যত না বেশি করেছে, তার থেকে অনেকগুণ বেশি কাজ করেছে বিরোধীদের নির্বুদ্ধি তা ফ্যাক্টর। বিজেপি চৌটালার সাথে সম্পর্ক ছেদ করল। সেইসাথে জোট গড়তে পারল না ভজনলালের জনহিত কংগ্রেসের সঙ্গে। ফলে শেষ অবধি যা দাঁড়াল ওমপ্রকাশ চৌটালার আই এন এল ডি, ভজনলাল আর তার ছেলে কুলদীপের দল ও বিজেপি আলাদাভাবে লড়াই করল। চৌটালার আসন সংখ্যা ৯ থেকে ৩১ গিয়ে পৌঁছল, ভজনলাল গোটা ছ'য়েক আসন পেলেন, বিজেপিও তার আসন সংখ্যা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ করল (২ থেকে ৪)। কিন্তু এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় একপ্রকার নগণ্যই। আরও আসন বাড়তে পারত, বিজেপি যে কোনও একজনের সঙ্গে জোট-এ গেলে (যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া হয় যে ওই তিন দলের জোট অসম্ভব) চৌটালার সঙ্গে গেলে বিজেপি-র ক্ষমতায় ফেরা তো ছিল অবশ্যম্ভাবী।

রাজ ঠাকরে

অরুণাচলে কংগ্রেসের ফল মোটামুটি ভাল। গতবারের থেকে আসন বেড়েছে প্রায় ৮টি। কংগ্রেস এখানে এককভাবে লড়েছে। ইউ পি এ শরিকরা যেমন এন সি পি ও তৃণমূল আলাদাভাবে লড়াই করেছে। তবুও বিরোধীরা এই অনৈক্যের ফায়দা তুলতে ব্যর্থ। সত্য সেলুকাস, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কি বিচিত্র এই বিরোধী-রা।

কেরল থেকে পাকিস্তানে জেহাদি পাঠানো হচ্ছে প্রশিক্ষণের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেরল ক্রমে উগ্রপন্থী, জেহাদি, সন্ত্রাসবাদীদের জন্য উর্বর উৎপাদনভূমি হয়ে উঠেছে। সিমি-র মতো জেহাদি, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদীরাও রাজ্য সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের এক গোপন সূত্রে একথাই বলা হয়েছে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মুল্লাপল্লী রামচন্দ্রণ বলেছেন, কেরলে জেহাদিদের অবস্থান বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্টে কোনও আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের এই খবর এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন এক বছর আগে সন্ত্রাসবাদ দমনে গৃহীত দৃঢ় ব্যবস্থা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল। এর মূল কারণ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুসলিম তোষণ নীতির ফলে আগত চাপ।

ওই গোপন তদন্ত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কেরল থেকে জেহাদি রিক্রুট করে বিভিন্ন খাড়ির দেশে (আরব রাষ্ট্রসমূহ) পাঠানো হচ্ছে। তারপর তাদের সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণের জন্য আরব দেশ থেকে পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। কেরল থেকে ব্যাপক হারে

আরব দেশে শ্রমিক হিসেবে যাওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো। ওই তদন্তমূলক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে— কেরল উপকূলে বড় বড় কন্টেনারে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। এর আগেও গোয়েন্দারা এবিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আরব রাষ্ট্রে শ্রমিকরা যাওয়ার ফলে দেশের ভিতরে ও বাইরে সন্ত্রাসবাদী জেহাদি গোষ্ঠীগুলির সুবিধা হচ্ছে। জেহাদিদের এজেন্টরা আরব দেশে যেতে আগ্রহী যুবকদের ট্যাপ করে। কেরলেই তারা বাছাই করার কাজটা করে ফেলছে। এর ফলে এখন কেরল থেকে আরবে যাওয়ার প্রবণতা বেশ বেড়ে গেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবে পৌঁছানোর পরই তাদেরকে উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ পুরো হওয়ার পর তাদেরকে দুবাইয়ের রাস্তায় ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেরলে পৌঁছেই তারা তাদের গোষ্ঠীর কাজে লেগে যায়।

এইসব কার্যকলাপ গোয়েন্দা বিভাগের নজরে আসার পরই চারটি নতুন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী গোয়েন্দা সংস্থা খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটি সংস্থার সদর দপ্তর তিরুঅনন্তপুরমে হবে। এই সংস্থা পুলিশকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আধুনিক ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ দেবে।

গুজরাট মডেলেই দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দেশের শিল্পায়নকে গুজরাট মডেলেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চান এদেশের শিল্পপতিরা। সেই জন্যে তাঁরা মনে করছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর-ই দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। সেঞ্চুরি টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান বি কে বিড়লা মনে করছেন, দেশের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে নরেন্দ্র মোদীরই প্রধানমন্ত্রী হওয়া দরকার। ইতিপূর্বে সুনীল মিত্তল এবং অনিল আম্বানীও একই অভিমত পোষণ করেছিলেন এই ব্যাপারে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, মোদীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে গুজরাট শিল্পে যেভাবে উন্নতি করেছে, তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে আখেরে দেশের লাভই হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২২ অক্টোবর তাঁর নতুন টেক্সটাইল মিলের উদ্বোধনে এসে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেন বি কে বিড়লা। যা শুনে সাংবাদিকদের রসিকতা করে মোদী বলেন, ''আচ্ছা, এটা তাহলে কালকে হেডলাইন হবে।''

মোদী রসিকতা করুন আর যাই করুন।

২০০৭-এ গুজরাতের তাবড় তাবড় শিল্পপতির সামনে ৮১৫ কোটি টাকার 'মউ' চুক্তি সাক্ষরিত হয় টেক্সাটাইল মিলের ব্যাপারে। এরপর ২০০৯-এও অনিল আম্বানী এবং সুনীল মিত্তল-এর উপস্থিতিতে একাধিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। সব মিলিয়ে শিল্পপতিরা মোদীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হবার যাবতীয় উপকরণ গত কয়েকবছর ধরেই খুঁজে পাচ্ছিলেন। যার মৌখিক প্রতিফলন ঘটল এতদিনে।

শহীদ মদনলাল ধিংড়া

ডঃ শ্রীরঙ্গ গোডবলে

শত-সহস্র শহীদের রক্তে রাঙানো ভারতবর্ষ একদা স্বাধীন হয়েছিল — সেই সমস্ত নাম না জানা অসংখ্য বিপ্লবীর দ্বারা যাঁরা হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন বৃটিশ বর্বরতা এবং সাক্ষী হয়েছিলেন অক্লেশে মৃত্যুবরণ, দ্বীপান্তর, জেল এবং পঙ্গু করার মতো নির্মম ঘটনার। শুধুমাত্র অনুনয়-বিনয় এবং জমায়েত আন্দোলনেই স্বাধীনতা মেলেনি। স্বাধীনতা এসেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে, যে বিদ্রোহের চরম পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহে। স্বাধীনতার দাবীতে। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের বাইরেও যাঁরা এই আন্দোলনকে সক্রিয় রেখেছিলেন তাঁরা হলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, বীর সাভারকর, মাদাম ভিখাজী কামা, ব্যারিস্টার সর্দার সিং রানা, বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, সর্দার অজিত সিং, লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, চম্পকরমণ পিল্লাই প্রমুখ। তেজোদীপ্ত বিপ্লবীদের এই তালিকায় নিজের আদর্শ ও মহান আত্মত্যাগের স্বকীয়তায় আলাদা করে একটা জায়গা যিনি করে নিয়েছিলেন তিনি হলেন মদনলাল ধিংড়া। ১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এই মদনলাল ধিংড়া। এই মহান আত্মত্যাগের শতবর্ষ পালিত হচ্ছে এই বছরেই (১৯০৯ - ২০০৯)।

মদনলাল ধিংড়ার জন্ম ১৮৮৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর অমৃতসরে। তাঁর বাবা ছিলেন অমৃতসরের একজন নামী চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সিভিল সার্জেন। মদনলাল ছিলেন তাঁর সাতভাই-এর মধ্যে ষষ্ঠ। তিনি বিয়ে করেন এবং তাঁর একটি পুত্র সন্তানও হয়। ইচ্ছে করলে সারাটা জীবন তিনি সংসার করে সুখে -স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বেছে নিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্গম-দুর্বার পথ। যাই হোক, ১৯০৬ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে তিনি রওনা হন বিলেতের উদ্দেশ্যে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় বীর সাভারকরের সঙ্গে।

সাভারকর লন্ডনে পৌঁছান ১৯০৬ সালের ১৫ জুন। তিনি মূলত আইন পড়তেই ওদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তাঁর মাথায় একটা অন্য ধরনের পরিকল্পনাও ছিল। তিনি আসলে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে মুষ্টিমেয় ইংরেজরা কিসের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়দের শাসন করছে। সেইসাথে খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন ইংরেজদের দুর্বলতাটাকে এবং সেই জায়গাটায় আঘাত করে ভারতীয়দের জন্য ইপ্সিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। এই লক্ষ্যে সাভারকর তৎকালীন সময়ে বিলেতে উপস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করারও চেষ্টা করেন। যার ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে সাতশো ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি বৈঠক করেন লন্ডনে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে, ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রাবাস তৈরির লক্ষ্যে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার লন্ডনে কেনা একটি বাড়ি যার নাম ইন্ডিয়া হাউস — সেখানে প্রবাসে ভারতীয়দের বিপ্লব প্রচেষ্টার যাবতীয় কাজকর্ম চলত। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ — এই চারবছর ধরে সাভারকর প্রতি রবিবার ভারতের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করতেন ওই ইন্ডিয়া হাউস-এ। সেখানে ইজিপ্ট, আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, চীন এবং তুরস্কে থাকা ভারতীয় বিপ্লবীরাও ওই আলোচনা চক্রে যোগ দিতেন। আসতেন মদনলাল ধিংড়াও।

সাভারকরের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের কাজে সামগ্রিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তিনি ১৯০৮ সালে যোগ দেন ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এ। তবে এই সংগঠনটি যুবকদের দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জঙ্গিপনা থেকে বিরত করার ব্যাপারে সবরকম চেষ্টা চালাত। এর একটা বড় কারণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ ব্যক্তিত্বরা এদের (ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) সমস্ত অনুষ্ঠানে আসত এবং পৃষ্ঠপোষকতাও করত। পুরো বিষয়টা লক্ষ্য করে সাভারকর, ধিংড়া ও অন্যান্য সহযোগী বিপ্লবীরা একটা ফন্দি আঁটলেন। সাভারকর ছিলেন সর্বজন পরিচিত বিপ্লবী। প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করে ইন্ডিয়া হাউস ছাড়লেন মদনলাল ধিংড়া। যার ফলে তিনি অতি সহজেই ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মিস এম্মা জোসেফাইন বেকের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হন। একই সঙ্গে ধিংড়া ন্যাশানাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নানান অনুষ্ঠানে আসা বিভিন্ন বৃটিশ অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকলেন। এমন সময় ধিংড়ার রোষানলে পড়লেন স্যার কার্জন উইলি।

এই কার্জন উইলি প্রথম জীবনে অর্থাৎ ১৮৬৬ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৮৭৯ সাল নাগাদ তিনি ভারতের রাজনৈতিক বিভাগে কর্তব্যরত আধিকারিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯০১ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রসচিব পদে অভিষিক্ত হন। একইসাথে তিনি বৃটিশ গুপ্তচর পুলিশের প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও এই তথ্যটির

সত্যতা স্বীকার করেনি সমকালীন বিলেতী সংবাদপত্রগুলি। যাই হোক, উইলি চেষ্টা করছিলেন সাভারকর এবং তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে খবরাখবর যোগাড় করতে। সেই লক্ষ্যে তিনি ইন্ডিয়া হাউসে একজন গুপ্তচরও নিয়োগ করেছিলেন। সেই গুপ্তচরের নাম ছিল কীর্তিকার। সে ওই হোস্টেলে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র সেজেই থাকত। যাই হোক, পরে সাভারকর ঠিকই জানতে পেরেছিলেন ওই কীর্তিকার কে এবং তার আসল উদ্দেশ্যই বা কি। এই কীর্তিকার, উইলির যাবতীয় কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিয়েছিল সাভারকরের কাছে।

১৩ এপ্রিল ১৯০৯। মদনলাল ধিংড়ার বড় ভাই কুন্দনলাল ধিংড়ার কাছে এল কার্জন উইলির একটা চিঠি। চিঠির সারমর্ম হলো, ইতিপূর্বে উইলির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে একটা কথা বলবার জন্য যে আবেদন করেছিলেন মদনলাল তা মঞ্জুর করেছেন উইলি। দেখা হতে পারে ১ জুলাই। মদনলাল ধিংড়া এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাবেন বলে স্থির করলেন। দেখা করলেন সাভারকরের সঙ্গে। বিপিন চন্দ্র পালের বাড়িতে ২৯ জুন বসল সভা। সেখানে ধিংড়া এবং সাভারকর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সস্নেহে কথাবার্তা বলছিলেন। উইলিকে মৃত্যুদন্ড দেবার যাবতীয় পরিকল্পনা সেখানেই ছকে রাখা হলো। মদনলাল ধিংড়াকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। সাভারকরের পরামর্শে নিরঞ্জন পাল উইলিকে হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধিংড়ার বিবৃতি টাইপ করে রাখলেন। সাভারকর ধিংড়াকে সেটা মুখস্থ রাখতে বললেন। এরপর তিনি বেলজিয়ামে তৈরি বাদামী রঙের একটা পিস্তল তুলে দিলেন মদনলাল ধিংড়ার হাতে। বললেন, 'যদি তুমি ব্যর্থ হও এবার, তবে তোমার মুখ আমাকে আর দেখিও না।" আবেগটা চেপে ধরে রেখে ধিংড়া বলে দিলেন, এমন ঘটনা ঘটতে তিনি দেবেন না।

পরের দিন অর্থাৎ ৩০ জুন, ধিংড়া ইন্ডিয়া হাউসে গিয়ে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং পরে অন্য কক্ষে পড়তে চলে গেলেন। তার পরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই ধিংড়ার এক সিংহলী বন্ধু শান্তি আগো তাঁর বাড়ি যান। কিন্তু ধিংড়া তাঁর আচার-আচরণ এতটাই স্বাভাবিক রেখেছিলেন যে তিনি ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারেননি যে, এমন একটা সাংঘাতিক কান্ড হতে চলেছে। ধিংড়া এরপর কোরেগাঁওকর নামে এক বিপ্লবী বন্ধুর কাছে গেলেন। এই সেই কোরেগাঁওকর যিনি ধিংড়াকে ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটে যাবার পথে সাহচর্য যুগিয়েছিলেন। যাই হোক, ১ জুলাই নিজের আত্মবলিদানের দিন ধিংড়া অন্যান্য সাধারণ দিনের তুলনায় একটু আগেই দুপুরের খাবার ও বিকেলের চা-টা খেয়ে নিয়েছিলেন। দুপুর দু'টো নাগাদ কোমরে রিভলবার গুঁজে ইম্পেরিয়াল হাউসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন তাঁর ১০৮ নম্বর লিডব্যারি স্ট্রীটের অফিস থেকে। কিন্তু সঙ্গে তাঁর আমন্ত্রণপত্রটাই নিতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

তবে খুব একটা অসুবিধা হলো না তাতে। যেহেতু তিনি ছিলেন ওই হাউসের একজন সহযোগী সদস্য। ভিজিটর'স বইতে সই করে ঢুকে পড়লেন ইম্পেরিয়াল হাউসের অভ্যন্তরে। তাঁর সঙ্গে ঢুকলেন কোরেগাঁওকর। কোরেগাঁওকরের কাছেও লুকনো ছিল একটা পিস্তল। মিটিং শেষ হবার পর, স্যার কার্জন উইলি বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। এমন সময় কোরেগাঁওকর ধিংড়া-কে তৎপর করলেন 'আভি যাও না, কেয়া করতে হো।' ধিংড়া সেইমতো চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উইলি'র সঙ্গে একান্তে বসতে চাইলেন। এরপর উইলি এবং মদনলাল দুজনেই কাঁচের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এবং নিচে নামতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়, ধিংড়া নিচু গলায় উইলিকে বললেন, একটা গোপন কথা তিনি তাঁকে বলতে চান। অতঃপর কার্জন উইলি তাঁর কানটা নিয়ে এলেন মদনলাল ধিংড়া-র মুখের কাছে। এই সুবর্ণ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন বিপ্লবী ধিংড়া। নিমেষের মধ্যে কোটের ডান পকেট থেকে বার করলেন রিভলবার। এবং পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর দু'বার গুলি করলেন। রাত তখন ১১টা বেজে ২০ মিনিট, লুটিয়ে পড়লেন কার্জন উইলি। ধিংড়া আবারও পর পর দু'বার গুলি ছুঁড়লেন। ছুটে এলেন এক পার্শী ডাক্তার। নাম কয়াস লালকাকা। তাঁকেও গুলি করলেন ধিংড়া, এরপর আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অন্যেরা জাপটে ধরলেন তাঁকে। পড়ে গেলেন ধিংড়া। ছিটকে পড়ল তাঁর চশমা। ধরা পড়ে গেলেন তিনি। পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কোনও বন্ধুকে খবর দিতে হবে? আমাদের নম্বর দিন আমরা দিয়ে দিচ্ছি"। পুলিশের চালাকি বুঝতে পারলেন তিনি। পাল্টা জবাব দিলেন, "তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে গ্রেপ্তারের খবর কালকে তাঁরা খবরের কাগজেই দেখতে পেয়ে যাবেন।" ধিংড়াকে নিয়ে যাওয়া হলো, ওয়ালটন স্ট্রীট পুলিশ স্টেশনে। ধিংড়া-র বিরুদ্ধে শুধুমাত্র কার্জন উইলি-কে হত্যার অভিযোগ এনেই ক্ষান্ত হলো না বিলেতী সংবাদমাধ্যমগুলি। তারা তাঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটাতে লাগল। বলতে লাগল ধিংড়া ভারতীয় মাদক অর্থাৎ ভাঙ্-এ আসক্ত। কিন্তু ধিংড়ার বাড়িওয়ালী মিসেস হ্যারিস স্পষ্ট বলে দেন তিনি কখনও তাঁকে ড্রাগ নিতে দেখেননি। সুতরাং বৃটিশ মিডিয়ার ধিংড়ার চরিত্র হননের চক্রান্ত পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়।

ধিংড়ার বিরুদ্ধে ধিক্কার সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আগা খান। সভায় ধিংড়ার বিরুদ্ধে ধিক্কার প্রস্তাব আনেন ভাবনাগরি। তাঁকে সমর্থন করেন আমির আলি। ওই সভায় একমাত্র সাভারকর প্রতিবাদ করেছিলেন ধিক্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এজন্য তাঁকে সভার মধ্যেই নিগৃহীত করেন এক ইউরেশিয়ান ব্যক্তি, নাম পালমের। সাভারকরের নিগ্রহের প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবশেষে সেই দিনটা এল। ১৭ আগস্ট, ১৯০৯। ধিংড়ার অসংখ্য বন্ধু সেদিন উপস্থিত পেন্টোভিলি জেলে। ইতিপূর্বে ওয়েস্টমিনস্টার পুলিশ কোর্টের বিচারক হোরেস স্মিথ-কে স্পষ্ট জানিয়েছেন ধিংড়া — তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নন। সুতরাং এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গেছে তাঁর ফাঁসি।

তাঁর যাবতীয় বইপত্র, জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি জাতীয় তহবিলে দান করে দিয়েছেন ধিংড়া। ফাঁসির মঞ্চে ফাঁসুড়ে হাডসন এসেছিল তাঁকে খৃস্টান মন্ত্রোচ্চারণ করাবে বলে। কিন্তু 'আমি হিন্দু' বলে তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় করেছেন ধিংড়া। ১৮ আগস্ট, ১৯০৯ লন্ডন টাইমস-এর সাত নম্বর পৃষ্ঠা ২ নং কলাম লেখা হয়েছিল, "৯টার কিছু পরে, মৃত্যুদন্ড ঘোষিত হল (মদনলাল ধিংড়া-র)। ফাঁসির দড়ি পরানো হলো তাঁর গলায়। দেহ নিথর প্রমাণিত হলে, দাহকার্য করার জন্য সেই দেহ দিতে অস্বীকার করা হলো। শেষ অবধি জেলের ঘেরাটোপের মধ্যে প্রচলিত রীতি মেনে সমাহিত করা হলো অসীম সাহসী মদনলাল ধিংড়া-কে।"

চ্যালেঞ্জ ঃ ধিংড়ার

আমি আগেই সত্যটা স্বীকার করে নিচ্ছি। দেশপ্রেমিক ভারতীয় যুবকদের দীপান্তর ও ফাঁসির চরম প্রতিশোধ হিসেবে আমি ইংরেজদের রক্ত ঝরানোর চেষ্টা করছি। এইবারের প্রচেষ্টায়, আমি কারুর সাথে কোনওরকম আলোচনা করিনি, যা করেছি সবই নিজের বিবেকের তাড়নায়। এর জন্য কেউ আমাকে প্ররোচিত করেনি, আমি শুধুমাত্র আমার কর্তব্য করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশ বিদেশী দাসত্বের শৃঙ্খলে মাথা নিচু করে আছে যা একটি নিরন্তর যুদ্ধের আবহ তৈরি করেছে। আমি বিস্মিত হয়ে দেখেছি, নিরস্ত্র সংগ্রামে খোলাখুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। বন্দুক থেকে অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুঁ হচ্ছিলাম, ততদিন আমি আমার সামনে পি ও তা থেকে গুলি ছোঁড়া অনুশীলন করে

একজন হিন্দু হিসেবে আমি অনুভব দেশের সঙ্গে অন্যায় করে আসলে ভগ করা হচ্ছে। দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যই শ্রীরা সেবাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা। আমার ক্ষুদ্র শরী মনে হয়েছে আমার মতো সন্তান যার মা কিছুই নেই। কিন্তু আমার জীবন রয়েছে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তাঁকে উৎসর্গ করছি

ভারতের আজকে আত্মাহুতি দিতে

মদনলাল ধিংড়া ও সমকালীন বাঙ্গলার বিপ্লব প্রচেষ্টা

অর্ণব নাগ

"আমার যে সব দিতে হবে
সে তো আমি জানি।"

বছরটা ১২৯০ বঙ্গাব্দ। পচা ভাদ্র যাই যাই করছে। আশ্বিনের আগমনী বার্তায় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে শরতের আবাহন। এর আরেকটি সাক্ষী উপস্থিত। সেটি হলো, পেঁজা পেঁজা সাদা তুলোর মতো মেঘ নিয়ে শরৎকালের নির্মল আকাশ। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের পরিস্থিতিটা আগাগোড়া বেশ অন্যরকম। সেখানে যেন সিঁদুরে টুকরো টুকরো মেঘের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সন্ধান যিনি পাচ্ছেন তিনিই আগামীদিনে সাভারকরের মদতে লন্ডনের মাটিতে শহীদ মদনলাল ধিংড়া-র কর্ণেল কার্জন উইলিকে হত্যার ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবেন। তাঁর নামটা তাই জেনে রাখা দরকার। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকা রাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে বৃটিশ শাসকদের। সুতরাং আপাতত তাঁর ঠাঁই হয়েছে কারাগারে। ক্ষোভে ফুটছেন বঙ্গবাসী। সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে ওই বছরের গোড়াতেই 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন। এই আঁচে সেসময় নিজেকে ভালোরকম সেঁকে নিচ্ছে বাঙালী। তবে এইসব এক-আধটা উনুন থেকেই আঁচটা আসছে না। মুখ্য উনুনটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু দক্ষিণেশ্বরে ধর্ম-কর্ম নিয়ে অকাতরে জ্ঞান বিলোচ্ছেন। আর বাঙালী সমাজের মাথাগুলো যেন হত্যে দিয়ে পড়ে আছে সেখানে। অন্যদিকে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় শিষ্যের মুখনিঃসৃত বাণী! বাপরে বাপ। যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে দেবে। বাঙলার সোনার টুকরো ছেলেগুলো তাতেই যেন পা বাড়াবে দুর্গম কন্টকাকীর্ণ বিপ্লবীয়ানার দিকে। এরপর রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ। এতেই তো রয়েছে পরাধীন, নিপীড়িত ভারতবাসীর স্বাধীনতার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, অনেক উনুন। এর স্তিমিত আঁচ আপাতত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর অগ্নিপরীক্ষায় লাগছে বটে, তবে আগামীদিনে এই আগুনেই ঝলসাবেন গোরাসর্দার লর্ড কার্জন। বিবেকবাণীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দাবানল হয়ে জ্বলবে।

(২)

'একা মোর গানের তরী....'

বাঙ্গলা থেকে অমৃতসরের দূরত্ব প্রায় ১১৫৩ মাইল। কথায় আছে, দাবানল নিমেষে ছড়ায়। উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণে এটা বেশ যুৎসই রকমের এভিডেন্স হতে পারে। যে সময়টার কথা বলা হচ্ছিল সেই সময়েই অমৃতসরে এক সম্ভ্রান্ত ধিংড়া পরিবারে জন্মালো একটি ফুটফুটে শিশু। জন্মলগ্নেই পন্ডিতরা ধারণা করলেন ভবিষ্যতে এর গাত্রবর্ণ খুব ফরসা হবে। তবে ছেলেটি ঈষৎ কৃশ। নাম রাখা হলো মদনলাল। বাংলা আর পাঞ্জাব। বিপ্লব প্রচেষ্টায় আর দেশভাগের ট্রাজেডি-তে এদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যেন যমজ দুই ভাই। এর প্রমাণ — ১৮৭৫-এ কলকাতার বুকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বক্তৃতা 'রাইজ অব্ দ্য শিখ পাওয়ার'। মুসলিম লীগ জন্মাতে তখনও ঢের দেরী। সুতরাং সৈয়দ আহমেদ খাঁ তখনও নিজেকে 'প্রথমে মুসলিম' গোছের

সাভারকর

কিছু ভাবছেন না। স্বাধীনতার পক্ষে দিব্যি বক্তব্য রাখছেন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে (তারিখ - ২৭ জানুয়ারি, ১৮৮৪) এবং লাহোরে (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪)। ইনিই পরবর্তীকালে বৃটিশ 'নাইট' উপাধি পাবেন, প্রচন্ড রাজভক্ত হবেন। সর্বোপরি দেশবিরোধী সাম্প্রদায়িকতায় মদত দেবেন। অন্যদিকে, বাঙ্গলাতেও লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাবের চূড়ান্ত বিরোধিতায় হিন্দু বান্ধব আবদুল গণির পৌত্র সালিমুল্লা। কিন্তু পরে তিনি ঋণভারে জর্জরিত হলে তাঁকে প্রায় ১ লক্ষ পাউন্ড, সুদে ধার দিয়ে কিনে নেবে মহারাণীর সরকার। রাজপ্রসাদ পেয়ে সৈয়দ ও সালিমুল্লা জুড়ে যাবেন আলিগড় আন্দোলনের ধারায়। যার মর্মান্তিক পরিণামে বঙ্গভূমি ও পাঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। যদিও সেসব ঘটতে তখনও পৌনে শতাব্দী দেরী রয়েছে। কিন্তু বাঙ্গলা আর পাঞ্জাবের সম্পর্কের গভীরতাটা বোঝাতে আরেকটা এভিডেন্সের উল্লেখ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নয়। ১৯২৮ সালে লাহোরে বৃটিশ সরকারি কর্মচারী স্কট সাহেবের লাঠি সরাসরি এসে লাগল লালা লাজপতের বুকে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। সেই লাঠির আঘাত বুকে বাজল নেতাজী সুভাষের। তৈরি হল ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ এবং গোরা পুলিশের ঘুম ছোটানো বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, যার সংক্ষিপ্ত নাম বি ভি।

(৩)

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান—"

যাই হোক, পাঞ্জাব কি পুত্তর মদনলাল ধীরে ধীরে কিশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে দেখতেও হয়েছে চমৎকার।

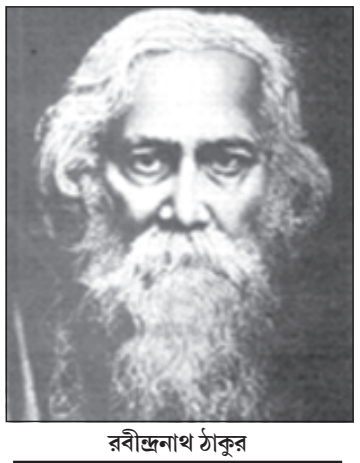

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেমনি ফরসা গায়ের রঙ তেমনি লম্বা গড়নের চেহারা। পড়াশোনায় বিশেষ মনটন নেই। মাথায় পোকাগুলো মাঝেমধ্যেই কিলবিল করে। বাবার অত পয়সা। সেই ছেলে কিনা প্রথমে কেরানীগিরি ধরল, তারপর রিকশো টানল, শেষে আর কিছু না পেয়ে শ্রমিকদের বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে খেপাতে লাগল। বাঙ্গলার তখন নিদারুণ অবস্থা। সময়টা ১৯০৪-১৯১১। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের একপ্রকার নিষ্পত্তি করেই ফেলেছেন বড়লাট লর্ড কার্জন। বলে দিয়েছেন, 'দ্য পার্টিশান অব্ বেঙ্গল ইজ্ আ সেটেলড্ ফ্যাক্ট।' সুরেন বাড়ুয্যেও ছাড়ার পাত্র নন। তাঁর জবাব, 'আই উইল আনসেটল দ্য সেটেলড ফ্যাক্ট'। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের নব্য পীঠস্থান টাউন হলে সমগ্র

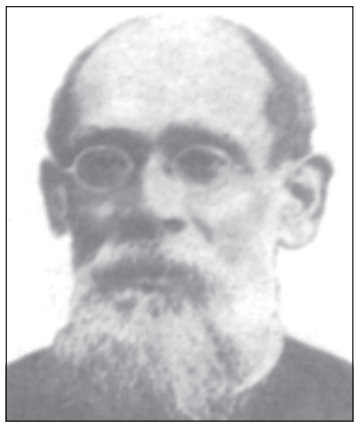

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় শিক্ষার প্রচলন করছেন, কখনও বা বঙ্গভঙ্গের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫)-র দিন সকলের হাতে পরিয়ে দিচ্ছেন হলুদ সুতোর রাখী। ক্যানভাসে তুলি বুলোচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ। ধরা পড়েছেন মানিকতলার মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে। তারিখটা ২ মে, ১৯০৮। অভিযোগ বে-আইনি বোমা রাখার। এরপর তিনি জেলে যাবেন। বিপ্লবী পদবাচ্য থেকে ঋষিতে উত্তরণ ঘটবে তাঁর। অমৃতসরে তখন অন্য দৃশ্য। বিয়ে দিয়েও অপগন্ড ভাইটিকে কোনওভাবে শুধরানো গেল না। তাই একপ্রকার জোর-জবরদস্তি করেই ১৯০৬ সাল নাগাদ ভাই মদনলালকে বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠালেন ডাক্তার বড়ভাই কুন্দন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেহাত বাঙালী জাতির প্রতিভূগণ মানে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ইন্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ একত্রিত হলেন। 'স্বদেশী' আর 'বয়কট' শব্দ দু'খানি রাতারাতি জুড়ে গেল বনেদি বিপ্লবীয়ানার অভিধানে। অন্যদিকে ওইদিনই দুপুর নাগাদ কলেজ স্কোয়ার থেকে কাতারে কাতারে ছাত্র ও যুবক রওনা দিল টাউন হলের উদ্দেশ্যে। আচমকা সেই মিছিল থেকেই জনৈক এক ছাত্র চেঁচিয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম' বলে। ব্যাস; দেশবাসী পেয়ে গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের মহামন্ত্র। সেই মহামন্ত্রের এমনই তেজ যে চাবুক খেয়েও উল্লাসকর দত্তের উল্লাস আর থামতেই চাইছে না। যত বেশি চাবুক পড়ছে পিঠে, তত সে তারস্বরে গাইছে, 'মাগো যায় যেন জীবন চলে। তোমার কাজে জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম্ বলে।' বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলা-র জীবনে তখন পরতে পরতে জড়িয়ে যাচ্ছে নানান বিচিত্র রঙ-বেরঙ। সেই ক্যানভাসে সবার রঙে রঙ মেশাচ্ছেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কাকা-ভাইপো। ভাইপো অবন ঠাকুর তখন স্বদেশী আন্দোলনে ব্যস্ত। নইলে জানতে পারলে খুশি হতেন, যে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করতে ১৮৭৮-এ তিনি বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সেই কলেজেই ভর্তি হলেন এমন একজন যিনি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশমাতৃকাকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করবেন ভবিষ্যতে।

(৪)

'চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিল কে'

অরবিন্দই শেষ রঙীন পোঁচটা টানলেন ক্যানভাসে। তারপর ক্যানভাস জুড়ে শুধু একটাই রঙ। রক্তাক্ত লালবর্ণের সেই রঙে বিপ্লবীয়ানার যাবতীয় রোম্যান্টিকতা উধাও। বিপ্লবীপন্থা তখন আর নিরস্ত্র প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ নেই, সশস্ত্রতার সীমানা অতিক্রান্ত করেছে সে, শিখেছে আধুনিকযুগের মীরজাফরদের শাস্তি দিতে। কিংসফোর্ডকে বোমা মারার চক্রান্তে ফাঁসি হলো ক্ষুদিরামের। সহযোগী প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়লেন। হাসপাতালেই তিনি বেছে নিলেন আত্মহননের পথ। কিন্তু রেহাই পেল না বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই। তাকে মারল কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বোস। ফাঁসিতে লটকালেন তাঁরাও। বঙ্গের রক্তাক্ত ক্যানভাস তখন মদনলাল ধিংড়ার বুকেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বার দুয়েক বাগে পেয়েও ফসকেছেন লর্ড কার্জনকে। ধিংড়ার টার্গেট-এর মানুষটা এখন পাল্টে গেছে। নামটা খালি পাল্টায়নি। নতুন টার্গেট সেনাবাহিনীর এক কর্ণেল — নাম কার্জন উইলি। পথনির্দেশ দিচ্ছেন সাভারকর, "যদি তুমি সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাক এবং তোমার মন চূড়ান্ত শৃঙ্খল মোচনের জন্যে তৈরি থাকে তাহলে দেশের জন্য আত্মবলিদানের এটাই সঠিক সময়।" না আর দেরি নয়। ১ জুলাই,১৯০৯। ইম্পেরিয়াল ইন্সটিটিউটে খতম কার্জন উইলি। ১৭ আগস্ট, ১৯০৯। মদনলাল ধিংড়া-র ফাঁসির দিন। ক্যানভাস আরও একবার রক্তাক্ত লাল। সময় দ্রুত এগোচ্ছে। ক্যানভাসের রক্তাক্ত লালবর্ণ ক্রমশ গোধূলি-র রক্তিম আভায় পরিণত হচ্ছে। বৃটিশ রাজের সূর্যাস্ত। রাত নামছে। এরপর নিকষ কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশ এবং দেশবাসী। এর নাম স্বাধীনতা। প্রভাত কখন হবে?

ড়ার অন্তিম বিবৃতি

অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। তাই যতদিন আমি ব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুঁড়তে অকৃতকার্য আমি আমার সামনে পিস্তল রেখেছিলাম ছোঁড়া অনুশীলন করে গেছি।

হিসেবে আমি অনুভব করছি যে, আমার য়ায় করে আসলে ভগবানকেই অপমান াতৃকার উদ্দেশ্যই শ্রীরামের উদ্দেশ্য। তাঁর সেবা। আমার ক্ষুদ্র শরীর ও স্বল্প বুদ্ধিতে ার মতো সন্তান যার মাকে দেবার মতো আমার জীবন রয়েছে এবং আমি আমার ন্ত তাঁকে উৎসর্গ করছি।

জকে আত্মাহুতি দিতে জানা দরকার এবং সেটা করতে গেলে আমাদেরকেই জীবন উৎসর্গ করতে হবে। সেইজন্যেই আমি আত্মাহুতি দিতে চলেছি এবং আমি আমার এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার জন্য গর্বিত। ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলবে। যতদিন না হিন্দু জাতি এবং ইংরেজ জাতির দ্বন্দ্ব বন্ধ হয় (যদি বর্তমানে চলা অস্বাভাবিক সম্পর্ক নিবৃত্ত না হয়)।

ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা : যতদিন না উদ্দেশ্য সফল হয়, ততদিন এই একই মায়ের গর্ভে যেন আমার পুনর্জন্ম হয় এবং এই মহান উদ্দেশ্যে যেন আমি মরতে পারি।

মানুষের মঙ্গলের জন্য, ভগবানকে গৌরবান্বিত করার জন্য দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতেই হবে।

নেতাজীর মৃত্যুর তারিখ ঘোষণা

ইস্টার্ন জোন, আলিপুরে, কম্যান্ড হাসপাতালের সামনের পার্কে নেতাজীর মূর্তির নীচে নেতাজীর জন্ম তারিখের সাথে সাথে মৃত্যুর তারিখ লেখার প্রতিবাদ স্বরূপ এই পত্রের অবতারণা। কম্যান্ড হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাস্য আপনারা নেতাজীর মৃত্যুর তারিখ কোথায় পেলেন? যে ব্যক্তির মৃত্যু আদৌ হয়েছে কিনা আর তার রহস্য উন্মোচন করার প্রচেষ্টা আজও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই সম্পর্কে কোনও অভিমত পোষণ ও প্রকাশ করা নেহাতই অর্বাচীনের কাজ বলেই মনে হয়।

নেতাজীর মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করার জন্য আজ অবধি তিনবার কমিশন, বহু অর্থব্যয়ে বসানো হয়েছে — শাহনওয়াজ কমিশন, খোসলা কমিশন ও মুখার্জি কমিশন। কেউই কিন্তু তা সে সরকারি নির্দেশেই হোক বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তদন্তেই হোক, সেই রহস্যের কিনারা আজ অবধি করতে পারেনি।

(১) প্রথম থেকেই বলা হয়েছে ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫ নেতাজি মাঞ্চুরিয়া যাবার পথে তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। অথচ মনোজ কুমার মুখার্জি দীর্ঘ তদন্ত করে বলেছেন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার কোনও প্রমাণ নেই, তাই হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু, ক্রিমেটোরিয়ামে তার দেহ সৎকার ও চিতাভস্ম ব্যাপারটি বেবাক মিথ্যা। সবই নিখুঁতভাবে হবিবুর রহমান, হাসপাতালের ডাক্তার, মিলিটারির লোকজনকে রিহার্সাল দিয়ে করানো হয়েছিল।

(২) হারিণ শাহ সর্দার প্যাটেলকে জানিয়েছিলেন, তাইপে মিউনিসিপ্যাল ব্যুরো অব হেলথ অ্যান্ড হাইজিনের ডিরেক্টর, নেতাজীর মৃত্যু ও তাকে দাহ করার ডিউটিতে যে দুজন কেরাণী ছিলেন তাঁদের ডকুমেন্ট দেখতে বললেন। তাঁরা ফরমোজার মানুষ। ফাইলে জাপানি ভাষায় যা লেখা ছিল তা হলো,

মৃত্যুর সার্টিফিকেশন —

(ক) ব্যক্তির নাম : ওকারা ইচিরো, জাপানী অফিসারের দেহ, নেতাজীর বলে দাহ করা হয়েছিল, (খ) লিঙ্গ : পুরুষ, (গ) জন্ম : ২২ মেইতি (বছর) ৯ এপ্রিল, ১৯০০, (ঘ) পেশা : তাইওয়ান মিলিটারি গভর্নমেন্ট আর্মির অনুগত অফিসার, (ঙ) মৃত্যুর হেতু : অসুস্থতা, (চ) অসুস্থতার সময় : ১৭ আগস্ট, ১৯৪৫, (ছ) মৃত্যুর সময় : ১৯ আগস্ট, বিকাল ৪টা, (জ) মৃত্যুর স্থান : আর্মি হাসপাতাল, (ঝ) ডাক্তারের নাম : ছুলুতা তোয়োজি চেনজে।

এই ছিল নেতাজির মৃত্যুর সার্টিফিকেট (জাপানী ভাষায়)।

অথচ এরপরও অর্থাৎ ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর পর প্রমাণ হয়েছিল তিনি রাশিয়ায় যেতে পেরেছিলেন। এবং সেসব ডকুমেন্ট রাশিয়ার মহাফেজখানায় রক্ষিত, এটাও প্রমাণিত। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টেই পাওয়া যায় নেতাজী তাইহোকু থেকে গোপনে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। সব থেকে কৌতুককর ঘটনা হল, নেতাজীকে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত বলে জাপানের একটি বেসরকারি জাপানি সংবাদ সংস্থাকে উদ্ধৃত করে রেডিওতে সংবাদ প্রচার হচ্ছিল, সে সময় উত্তর ভিয়েতনামের একটি বাড়িতে বসে নেতাজি সেই সংবাদ স্মিত হাস্যে শুনছিলেন।

(৩) জওহরলাল নেহরুর স্বপ্নপূরণ হয়নি, কারণ তিনি জানতেন যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। কিন্তু পরে জেনেছিলেন সংবাদটি ভুয়ো, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে তিনি নেতাজীর রাশিয়ার চলে যাওয়ার কথা নিজেই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।

(৪) ১৯৪৬ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরে নেহরুকে বলেছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা যাননি অতএব আপনি সাবধান আর আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনও সেনাকে যেন ভারতীয় ফৌজে না নেওয়া হয়। কূটকৌশলী জহরলাল তাই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আজাদ হিন্দ বাহিনীর নামে জনগণের দেওয়া সব অলঙ্কার ও টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছিলেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করাটা নেহরু পরিবারের ও তার অনুগামীদের বৈশিষ্ট্য।

(৫) সঠিক ব্যাপারটি হলো — ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান বন্দরে যে বিমানটি (আমেরিকান সি-৪৭) ২৬ জন আমেরিকান যুদ্ধবন্দী নিয়ে তাইতুঙের ট্রাইডেন্ট পাহাড়ে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সব যাত্রীই মারা গিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা নেতাজীর পার্শ্বচর হবিবুর রহমান কি দুটি পোড়া হাত নিয়ে নেতাজীর মৃত্যুর খবর দেবার জন্য বেঁচে রইলেন যেখানে সকল যাত্রীই মারা গেল!

(৬) মুখার্জি কমিশনের পক্ষ থেকে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরমোজা কর্তৃপক্ষের নিকট আসল ঘটনা জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং ফরমোজা কর্তৃপক্ষ মুখার্জি কমিশনকে জানিয়েছেন যে, ১৯৪৫-এর ১৪ আগস্ট থেকে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে তাইহোকু বিমানবন্দরে কোনও বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। তাই রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাইভস্ম নেতাজির নয়। আর নেতাজী আহত অথবা নিহত হবার কোনও ছবি কোথাও নেই।

(৭) নেহরু ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ শ্যামলাল জালানকে একটি চিঠি টাইপ করতে বলেছিলেন। তাতে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, মিত্রপক্ষে থেকে রুশ নায়ক স্ট্যালিন নেতাজীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এটা ঠিক হয়নি। তাহলে জওহরলাল জানতেন নেতাজী মারা যাননি।

(৮) ১৯৪৫ সালে ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা গেছেন বলে এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রের বড়দাকে বলেছিলেন যে “শ্রাদ্ধ করবেন না”। মৃত্যু যে হয়নি এই সম্পর্কে কতটা নিশ্চিত না হলে যে এই কথাটা বলা যায় এটা সহজেই অনুমেয়। আর আজ অবধি নেতাজীর মৃত্যুর কোনও ডেথ সার্টিফিকেট নেই।

জাপানি ডাক্তারের সাথে সাথে হবিবুর রহমানও নেতাজির মৃত্যুর সময় ও পরে বিভিন্নভাবে যা বক্তব্য দিয়েছেন তাতে এতই অসংগতি যে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(১০) শাহনওয়াজ ও খোসলা ছিলেন জওহরলাল ও ইন্দিরাদের খুবই কাছের লোক। তাই যাবতীয় মৃত্যু ও তদন্ত রহস্য তাঁরা যা বলেছেন উপরিউক্ত ওই দুই কমিশন নেহেরু ও গান্ধীর মনোমত রিপোর্ট দিয়ে নেতাজীকে মৃত বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু মুখার্জি কমিশন সত্যের পথে যাওয়াতে তার তদন্তের ফল-কে খারিজ করে দিয়ে কংগ্রেস বিরোধী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাজীকে ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এ জোর করে মৃত বলে ঘোষণা করার হীন অপকৌশল গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি নেহরু থেকে কেন্দ্রে গদীয়ান সকল প্রধানমন্ত্রী।

পরিশেষে জানাই, যে ব্যক্তির এখনও জন্মদিন পালন করা হয় অথচ মৃত্যু রহস্যের জন্য মৃত্যুদিন পালনে কোনও ব্যবস্থাই নেই। কম্যান্ড হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নেতাজীর মূর্তির নীচে সেই ব্যক্তির মৃত্যুদিন ঘোষণা করার স্পর্ধা দেখায় কি করে?

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

বিমান বসুর স্বীকারোক্তি

দলের নেতা, কর্মীরা নানা পথে টাকা তোলেন — কবুল করেছেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিমান বসু। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ (কাকাবাবু)-র ১২১ তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক দলীয় আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন — এখন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষ এসব পছন্দ করছে না। ভোটে পরাজয়ের জন্য দলের নেতা কর্মীদের দুর্নীতি ও আচরণ বহুলাংশে দায়ী। নিষ্ক্রিয় কর্মীদের চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে। ত্রুটি সংশোধন করে দলে নতুন রক্ত এনে আবার এগোতে হবে।

বিমানবাবুর এহেন স্বগতোক্তি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন, দল যে দুর্নীতিবাজ, তোলাবাজ, বাটপাড়, জালিয়াত, মাফিয়া, মস্তানদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে তা স্বীকার করতে বিমানবাবুদের এতদিন লাগল? এতদিন তবে কি তাঁরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেজে ছিলেন, না কি জেগে ঘুমোচ্ছিলেন? আজ জন-সমর্থনে ভাটা পড়তেই, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতেই তাদের বোধোদয় হলো যে দলের নেতা কর্মীরা দুর্নীতিবাজ? তোলাবাজ?

প্রোমোটার, মাফিয়া, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পার্টির এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীদের কিসের সম্পর্ক, পার্টি অফিসগুলি কাদের টাকায় প্রাসাদে পরিণত হলো — সে সবের খোঁজ-খবর বিমানবাবুরা নিয়েছেন কোনওদিন? নেননি। কারণ ক্ষমতা ভোগ করতে হলে চাই ভোট, আর ভোটের জন্য চাই ক্যাডার, মস্তান, গুন্ডাগর্দি, মাসলম্যান, অর্থ ইত্যাদি। কাজেই পার্টিতে যদি দুর্নীতিপরায়ণ সমাজবিরোধীরা ঢুকে পড়ে থাকে বা নেতা কর্মীরা তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও থাকেন তবে তা পার্টির হিতে ভোটে রিগিং, জালিয়াতিতে সাহায্যই করেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও বিমানবাবুদের বিধি বাম। শেষ রক্ষা তাঁদের হয়নি। আর শেষ রক্ষার যাঁরা মালিক সেই জাগ্রত জনতা দিয়েছেন তাঁদের পাশা উল্টে। যার ফলশ্রুতিতে বিমান অ্যান্ড কোম্পানীর লাভজনক রাজনৈতিক ব্যবসায় ঘটেছে ব্যাপক বিপর্যয়। অর্থাৎ ভোটে হয়েছে চূড়ান্ত ভরাডুবি।

এখন দুর্নীতির ‘ভাইস্’ আক্রান্ত পার্টির নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে দিয়ে নতুন রক্তের আমদানি ঘটালেও সেই রক্ত অদূর ভবিষ্যতে যে ‘ভাইস্’ মুক্ত থাকবে, সংক্রামিত হবে না — এমন গ্যারান্টি কী বিমানবাবু দিতে পারবেন? আসলে যারা আসবে তারা তো পূর্বসূরীদের পথই অনুসরণ করবে! তাই বলছি বিমানবাবু, সেই বুঝলেন, তবে বড্ড দেরিতে।

ধীরেন দেবনাথ, এ৮/১৭৫, কল্যাণী, নদীয়া।

হারিয়ে যাওয়া কালীপূজা

১৯৫২ সালের কথা। বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপের নাম ভোলা। ভোলা বরিশাল জেলার একটি মহকুমা শহর। এই শহরের তিন কিলোমিটার উত্তরে একটি হাটের নাম তুলাতলি হাট। হাটের পশ্চিম দিকে একটি হিন্দু গ্রাম ছিল। গ্রামের নাম নতুল্লাবাদ, সেখানে একটি বিখ্যাত কালীমন্দির ছিল। দূর-দূরান্তের গ্রাম শহর থেকে লোক আসতো সেই মন্দিরে পূজা দিতে। বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে সেই মন্দিরে ছিল এক গম্ভীর পরিবেশ।

একদিন একটা অশুভ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। কতিপয় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এসে ভেঙ্গে ফেলেছে সেই দেবী প্রতিমা। আর সেখানে রেখে দিয়েছে একটা গরুর কঙ্কাল। নির্দেশ জারি করা হয়েছে, এই গ্রামে আজ থেকে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হলো। তারপর হারিয়ে গেলো সেই কালীপূজা। জনশূন্য হলো নতুল্লাবাদ গ্রাম। এখনো মনে পড়ে সেই কালীপূজা আর হারিয়ে যাওয়া গ্রামের কথা। যখন শারদ উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহর ভরে যায় আনন্দের প্লাবনে;তখন স্মৃতির সমুদ্রে নেমে আসে নতুল্লাবাদের অন্ধকার।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

গলা কেটে দু’বেলা দুটো রুটি দেওয়া যায় না

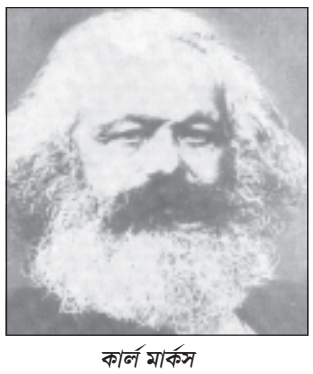

অরবিন্দ ঘোষ

কার্ল মার্কস

ডঃ বোরলগ

— বুঝতেই পারছেন বক্তব্যটা ‘বিপ্লবী’ কোবাড ঘ্যান্ডী-র ছন্খচট্টডড গুড্রট্টত্ত্বডডঢগ্ন (— গান্ধী নয়, ইন্দিরাও ঘ্যান্ডী ছিলেন, গান্ধী নয়)। দিল্লী পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল — এই কথাটা তিনি সেদিন বলেছিলেন, মহিলা সাংবাদিক জ্যোতি পুনয়াণী-কে, মুম্বাই শহরে। কোবাড ঘ্যান্ডী সম্বন্ধে সব কথাই প্রায় খবরের কাগজে লেখা হয়ে গেছে। প্রায় সকলেই পড়েছেন। কাজেই নতুন কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এখন কোবাড ঘ্যান্ডী-র পুরো বক্তব্যটা শেষ করি। “এখন ঠিক এমনি করেই নির্বিকার চিত্তে শ্রেণী শত্রুদের মুন্ডহীন করতে হবে”। এই হলো নকসালদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই ভারতের এক কোণে, জঙ্গলের মধ্যে ‘মুক্তাঞ্চ ল” গড়ে সেখান থেকে সারা ভারতে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে। হিন্দী টিভি সিরিয়ালের ‘মুঙ্গেরিলালের সুন্দর স্বপ্ন ”-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই স্বপ্নের কথা শুনে।

কিন্তু আমি নকসালবাদ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চাই না। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতারা এই বিষয়টা ভালই বুঝতে পারছেন। ওঁদেরই জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনারা শুনেছেন কি না জানি না। বঢত্তড্রত্র ত্ত্বখ্ব বলে একটা টেলিভিশন চ্যানেল আছে। অর্ণব গোস্বামী যার প্রধান সম্পাদক, কিছুদিন আগে গৌর চ্যাটার্জী নামে এক “Overground” নক্‌শাল নেতাকে interview করেছিলেন। সেই ভদ্রলোক নকসালদের দ্বারা হত্যা ইত্যাদির সমর্থনে বলার চেষ্টা করেন ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে — তাঁদের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ জনতা যাতে দিনে “দুটো রুটি” খেতে পান। যে কথা “উনি” নাকি ২৫০ বছর আগে লিখে গেছেন। নামটা নেননি, কিন্তু স্পষ্টতই উনি কার্ল মার্কস-এর কথা বলতে চাইছিলেন।

আমি Das Capital পড়িনি। কিন্তু জানি যেসব রাজনৈতিক নেতা পৃথিবীতে এই

জনমত

দর্শন নিয়ে “বিপ্লব” করেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নিকৃষ্ট ধরনের হত্যাকারী হয়ে গিয়েছিলেন — স্ট্যালিন, মাও ইত্যাদিরা।

এই সেপ্টেম্বর মাসেই পৃথিবীর একমাত্র কৃষি বৈজ্ঞানিক ডঃ নরম্যান বোরলগ, যিনি শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, ৯৫ বছর বয়সে মারা যান। তিনিও সারাজীবন সংঘর্ষ করেছেন। পৃথিবীর জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে। এই শত্রুর নাম, ক্ষুধা — Hunger¼ “Dr. Norman Borlaug was the greatest fighter in the world aganist hunger”। এই কথা অনেকেই বলেন, যা অত্যন্ত সঠিক।

তিনি ১৯৬১-৬২ থেকে ভারতে আসছিলেন আর ভারতের কৃষিতে “সবুজ বিপ্লব” (Green Revolution) ঘটাতে তাঁর ভূমিকা চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে সকলেই স্মরণ করবেন। গম শস্যে এই বিপ্লব আসে ১৯৬৮ সালের রবি ফসল কাটার সঙ্গে। যারা কৃষি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বা লেখেন — বর্তমান সাংবাদিকের মতো তাঁরা জানেন যে এই সবুজ বিপ্লব ও আমেরিকা থেকে পি এল ৪৮০ গমের বীজ import না হলে ভারতে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের চেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিত — ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো। ১৯৬৭-৬৮ নাগাদ আমি দিল্লীর হিন্দুস্তান টাইমস্ কাগজের বিশেষ কৃষি সাংবাদিক ছিলাম, প্রায় ১৫ বছর। কাজেই জেনেশুনেই এই কথাটা লিখছি। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ দু’বছরই খরা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছিল।

এখন সেই নকশাল নেতার কাছে জিজ্ঞাস্য, কত লাখ শ্রেণী শত্রুর গলা মুরগীর মতো ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল ডঃ বোরলগকে। যার ফলে কোটি কোটি ভারতীয় নাগরিক দু’বেলা “দো রোটী” খেতে পারছেন? ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কে বিজয়ী হয়েছেন ও ভবিষ্যতেও হবেন — কার্ল মার্কস না নরম্যান বোরলগ ও অন্যান্যরা?

(এরপর ১২ পাতায়)

আমডাঙ্গার করুণাময়ী কালীমন্দিরে
পূজিত হচ্ছে যশোরেশ্বরীর অবিকল বিগ্রহ

পরম্পরা

সোমনাথ নন্দী

ঝড় — প্রবল ঝড়। তার দাপটে ছিন্নভিন্ন জীবনে বাঁচার ইচ্ছা। ঊষর মরুভূমির মতো করে তুলেছে জীবনভূমি। শুকিয়ে গেছে সব আবেগ, সব রসস্নিগ্ধতা মাতৃসাধক রামানন্দ গিরির জীবন থেকে। আরাধ্যাদেবী মা যশোরেশ্বরীর অন্তর্ধানে তিনি মৃতবৎ। 'মা বিনে আর ছেলে বাঁচে না'-এতো সেই অবস্থা। এই রিক্ততাই গ্রাস করেছে রামানন্দকে। সর্বোতভাবে।

বারো ভুঁইয়া অর্থাৎ ষোড়শ শতকে বাংলার বারো জন স্বাধীন সামন্ত রাজার অন্যতম যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য রায়ের উপাস্য ও রাজ্যের কুলদেবী মা যশোরেশ্বরী। সেই জাগ্রতা দেবীর কৃপায় প্রতাপ হয়ে উঠেছিলেন অজেয়, অদম্য ও দুর্দ্ধর্ষ। মুঘল সম্রাট আকবরের অপরাজেয় বাহিনী তার কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে বারবার। এমনকী আকবর পুত্র সেলিমের নেতৃত্বকেও স্পর্ধা জানিয়েছিলেন প্রতাপ। বাধ্য হন সেলিম পিছু হটতে। মূলে ছিল দেবীর অপার কৃপা।

কিন্তু — সে কৃপাও একদিন স্তিমিত হয়ে আসে। কারণ প্রতাপের চরিত্রের অধোগতি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিপ্লবীদের কাছে প্রতাপ যতই দেশপ্রেমিক বা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি পান, সমকালীন ইতিহাস দেয় অন্য বার্তা। খসে পড়ে তাঁর আদর্শের মুখোস।

স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রতাপ চরিত্র গভীরভাবে পর্যালোচনা করে 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে যে তথ্য তুলে ধরেছেন বাংলার পাঠকদের সামনে তাকে ইতিহাসসিদ্ধ বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথায় — "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময় বাংলা দেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করার চেষ্টা চলেছিল, আমি সে সময় তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোক (বৌ ঠাকুরানীর হাট / সূচনা)।

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বৃত্তান্তের সাথে একমত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণে প্রতাপ অন্যান্য বারো ভুঁইয়াদের মতো দেশে অরাজকতার সুযোগ নিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কোনও প্রাচীন রাজবংশের পরম্পরাজাত ছিলেন না। নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রতাপ সে অর্থে অতুলনীয় বীরও ছিলেন না।

প্রায় একই দৃশ্য দেখা যায় দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় রচিত ক্ষিতিশ বংশাবলীতে। সেখানে ব্যক্তি প্রতাপের স্বার্থপরতা ও লোভ নিজের কাকা বসন্ত রায়কে পর্যন্ত হত্যায় প্ররোচিত করে। অথচ প্রতাপের বাবা হরি রায় ও কাকা বসন্ত রায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় যশোর স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতাপের রাজ্য বিস্তারে প্রধান সহায়ক ছিলেন কাকা বসন্ত রায়। তাঁকেই পথের কাঁটা মনে করেন তিনি।

আকবরের মৃত্যুর পর মুঘল মসনদে বসেন সেলিম 'জাহাঙ্গির' উপাধি নিয়ে ১৬০৫ সালে। জাহাঙ্গির ভোলেননি প্রতাপের কাছে স্বীয় পরাজয়কে। প্রতাপকে দমন করার জন্য সেবছরই অম্বররাজ মানসিংহকে তিনি সেনাপতি করে পাঠালেন বাংলায়।

চতুর মানসিংহ প্রথমে অনুসন্ধান করেন প্রতাপের অজেয় থাকার কারণ। জানলেন প্রতাপের সুবিধা হল তার রাজ্যের জল-জঙ্গলে ভরা ভীষণ প্রাকৃতিক অবস্থান ও সর্বোপরি কুলদেবী যশোরেশ্বরী কালীর কৃপা। মানসিংহ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন।

যুদ্ধাভিযানের আগে কিছুদিন দেবীর আরাধনা করলেন বিজয় প্রাপ্তির জন্য। এ ব্যাপারে তাঁকে উপদেশ দেন কাশীর শক্তিসাধক কামদেব ব্রহ্মচারী। পূজা সমাপ্ত হলে মানসিংহ দেবীকে দর্শন করেন স্বপ্নে। দেবী তাঁকে বলেন — প্রতাপ আমাকে চলে যেতে বলেছে। আমি তাই তাঁকে ত্যাগ করেছি। আমি থাকলে তাঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব। বর্তমানে আমি আছি সমুদ্রে, খাড়ির জলের তলায়। তুমি আমায় সেখান থেকে তুলে পুজো করলে বিজয় হবে তোমার।

আসলে দেবী রুষ্টা হয়েছিলেন প্রতাপের অত্যাচার, কপটাচার ও প্রজাপীড়নে। তাঁকে ত্যাগ সে কারণে। সুযোগ পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করেন মানসিংহ দেবীকে খাড়ি থেকে তুলে। যদিও এটা প্রচলিত জনশ্রুতি।

অন্য কাহিনী হল মানসিংহ মন্দিরের এক ব্রাহ্মণকে উৎকোচে বশীভূত করে দেবীমূর্তি অপহরণ করে নিজের অধিকারে আনেন। যদিও ঘটনা ঘটে প্রধান পুরোহিত রামানন্দ গিরির অনুপস্থিতিতে। কিন্তু প্রতাপ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রামানন্দের মতো সাধককে যারপরনাই অপমান করে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন। যশোরেশ্বরীর অভাবে প্রতাপ মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন শোচনীয়ভাবে। বন্দী অবস্থায় দিল্লী যাওয়ার পথে মৃত্যু ঘটে তাঁর।

এদিকে দেবীকে হারিয়ে উন্মাদপ্রায় রামানন্দ। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন বর্তমান বারাসতের সূক্ষ্মাবতী নদী (বর্তমানে সুঁটির খাল) তীরবর্তী জঙ্গলে। বারসত তখন যশোর রাজ্যাধীন। প্রতাপের পতনের পর তা হয় জমিদার ভবানন্দ মজুমদারের শাসনাধীন। ভবানন্দকে এই ভূখন্ড দেন মানসিংহ, প্রতাপের সাথে যুদ্ধে সাহায্য করার কারণে।

আমডাঙ্গার করুণাময়ী কালীমন্দির। (ইনসেটে রত্নবেদী)

যশোরেশ্বরী মানসিংহের অম্বর কেল্লায় মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হলেন বটে। দেবী কিন্তু ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সন্তানকে। মানসিংহকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বললেন — তুমি আমার আকৃতির একটি অনুকৃতি বিগ্রহ তৈরি করে আমার পরম ভক্ত রামানন্দ গিরিকে দিয়ে এস এবং সে বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করবে তাঁর সাধনাক্ষেত্রে করুণাময়ী নাম দিয়ে।

অম্বরাধিপতি মানসিংহ করুণাময়ীর মূর্তি নিয়ে আসেন বাংলায়। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা পান সাধকের। বর্তমান আমডাঙা (বারাসত) কালীবাড়ির স্থানে। মহারাজ জানান তাঁকে দেবীর আদেশ। মূর্তি সমর্পণ করেন তাঁকে। তৈরি করেন একটি সাধারণ মানের একতলা মন্দির। কোনও মন্দির শৈলী অনুসৃত হয়নি তাতে। বলা যায় তৈরি জমিদারদের কাছারি বাড়ির আদলে। মানসিংহ দেবীর গর্ভমন্দিরের দরজা নির্মিত করান রাজস্থানী কারুকার্য সমন্বিত চন্দনকাঠে। রামানন্দ হন দেবীর প্রথম পুরোহিত তথা আমডাঙা মঠের প্রথম মোহন্ত।

আমডাঙা করুণাময়ী মন্দিরের দ্বিতীয় সংস্কার হয় নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সময়। মহারাজ ছিলেন প্রবল শাক্ত অনুরাগী। ১৭৫৬ সালে তিনি প্রথম মা করুণাময়ীকে দর্শন করেন আমডাঙায়। যে সময় নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বিশাল বাহিনী নিয়ে কলকাতায় ইংরাজদের আক্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সে বাহিনীতে কৃষ্ণচন্দ্রও যোগ দেন। কিছুটা বাধ্য হয়ে। নবাবের বাহিনী আমডাঙায় এলে কৃষ্ণচন্দ্রের দেবী দর্শনের সৌভাগ্য হয়। ১৭৫৭ সালে সিরাজের পরাজয়ের সাত বছর পর বাংলার মসনদ দখল করেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম। মীরকাশিমের সাথে মতবিরোধের কারণে নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দি করে মুঙ্গেরের বন্দিশালায় রাখেন এবং ইংরাজদের সাথে সহযোগিতার অজুহাতে প্রাণদন্ডের আদেশ দেন। কিন্তু — মহারাজ অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভ করেন মুঙ্গের কারাগৃহ হতে আমডাঙা মঠ ও মন্দিরের দ্বিতীয় মোহন্ত নারায়ণ গিরির দৈবক্ষমতা বলে।

কৃতজ্ঞ মহারাজ ১৭৬৫ সালে করুণাময়ী মন্দির সংস্কারে ব্রতী হন। দেবালয়ের দ্বিতল তাঁরই নির্মিত। দেবীকে সেসময় নীচের তল থেকে মন্দিরের নবনির্মিত দ্বিতলে স্থানান্তরিত করা হয়। দেবীর সেবার জন্য দান করেন ৩৬৫ বিঘা নিষ্কর জমি। তারও আগে ১০০০ বিঘা জমি দাম করে ডায়মন্ডহারবারের মুড়াগাছার বরদাচরণ রায়চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

করুণাময়ী মন্দিরের মঠাধীশরা প্রথম থেকেই ছিলেন শক্তিসাধক। তাঁরাই মন্দির কেন্দ্র করে মঠ স্থাপন করেন। মঠের অষ্টম মোহন্ত অচলানন্দ গিরি ১৮৬৬ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। সে সূত্রেই উক্ত সময়ের কিছুকাল পর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাময়ী দর্শন। অন্য আকর্ষণ হল মন্দিরের একতলায় অবস্থিত ১০৮ শালগ্রাম শিলার উপর তৈরি রত্নবেদী। যেখানে উচ্চকোটির সাধকদের বসার অধিকার। সম্ভবত দেবীর নির্দেশে এই রত্নবেদী। শ্রীরামকৃষ্ণ এই রত্নবেদী দর্শনে আপ্লুত হন। অষ্টাদশ শতকের সাতের দশকে সাধক রামপ্রসাদ দেবী ও রত্নবেদী দর্শনে মুগ্ধ হন। তিনি আসতেন এখানে সময়ে সময়ে মাকে সঙ্গীত সুধা পান করাতে।

করুণাময়ী মঠের চলার গতি তিন শতক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ থাকলেও ১৮৬৮ সালে মোহন্ত স্বামী অচলানন্দের দেহান্তের পর শুরু হয় নানা বিশৃঙ্খলা। ১৮৯০-এ তা চরমে ওঠে মোহন্ত ওমরাও গিরির আমলে। আসলে মঠ যেদিন থেকে তারকেশ্বর মঠের অধীনস্থ হয়, সমস্যা সে সময় হতেশুরু। তারকেশ্বর মঠের উক্ত সময়ের কদাচার, বিশৃঙ্খলা বহুলাংশে না হলেও কিছুটা স্পর্শ করে আমডাঙা মঠকে। শুরু হয় মামলা মোকদ্দমা। ১৯১০ সালে মঠের অচলাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য তৈরি হয় মঠ সংরক্ষণ সমিতি। সেই সময় করুণাময়ীয় মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য আরম্ভ হয় করুণাময়ী মেলা — ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর।

আমডাঙা এই মঠের ১৮ জন মোহন্তের মধ্যে দু-একজন ছাড়া (অচলানন্দ, নৃসিংহ আশ্রম ও শিবাশ্রম) অধিকাংশই জীবনে মোহের অন্ত ঘটাতে পারেননি। ফলত, মোহন্ত রতন গিরির সময় নতুন করে শুরু হয় মামলা মঠাধীশ পদের উত্তরাধিকার নিয়ে। ১৯৫৫ সালে উচ্চ ন্যায়ালয়ের এক আদেশ বলে মঠ প্রশাসক হাওড়া জেলা জজ এফ রহমান সাহেব। পরিচালন ভার যায় মঠ সংরক্ষণ সমিতির হাতে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের পরিচালন সূত্র অনুসারে বলা হয় সমিতি হবে ৭ সদস্যের। দু'জন জেলা জজের মনোনীত সদস্য, তিন সদস্য তারকেশ্বর মঠ নিযুক্ত (এর মধ্যে ১ জন মোহন্ত), ১ জন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য। এই সমিতিই বর্তমানে মঠ ও মন্দিরের দিনচর্যাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন। সংরক্ষণ সমিতির বর্তমান সম্পাদক স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু বিশ্বাস মন্দিরের সাবলীলতা প্রশংসনীয়ভাবে বজায় রেখেছেন।

বাঙালী তনয়াদের গর্ব
দময়ন্তী সেন

ইন্দিরা রায়

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করতে দেবার অধিকারের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দির পরিকাঠামোয় নারীদের অজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দিতে নারী জয় করেছে তার ভাগ্য এবং আজ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীর স্থান শীর্ষে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আজ মহিলারা উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ জাজ্জ্বল্যমান। সম্প্রতি এমনই এক নারীর 'প্রথমা' হওয়ার সংবাদে মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা গর্বের পালক সংযোজিত হলো। তিনি হলেন কলকাতার প্রথম মহিলা গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন। ছোটবেলা থেকেই নির্ভীক স্বাবলম্বী দময়ন্তী জীবনে কিছু একটা করা অর্থাৎ মেয়েরাও যে নিজ গুণে ও কর্মদক্ষতায় বিশেষ জ্ঞান করে নিতে পারে সে ব্যাপারটাকে বাস্তবায়িত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ডি সি (নর্থ) হিসেবে দময়ন্তী সেনের সঙ্গে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার ব্যাপারে ওনার অভিমত জানতে চাওয়া হলে বলেছিলেন — এখনকার দিনে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবাই জানে যে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে কোনও উপায় নেই। হ্যাঁ, একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের কোন ব্যাপারেই কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না। মেয়েদেরও যে Self Sufficient হতে হয়, তা সেখানে হোত না। এখন অবস্য আত্মসচেতনতা বেড়েছে। বর্তমান দিনকাল খুবই কঠিন, এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা হয়েছে।

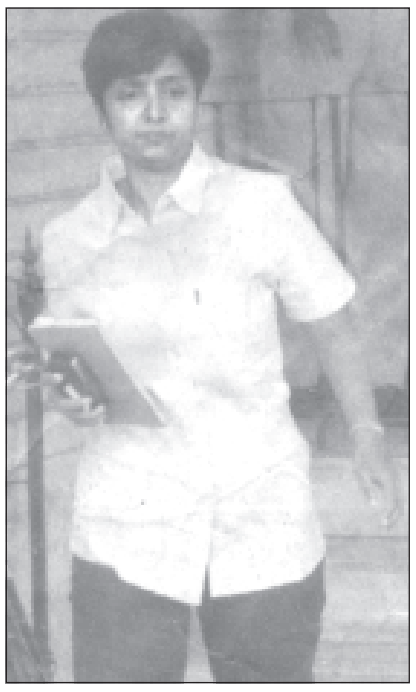

অনেক ব্যাপক হয়েছে, ফলে চাকরিও নানা ধরনের হয়েছে। আগে সামাজিক পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে মেয়েদের নিরাপদ ও সমমানের কাজ ছিল স্কুলের চাকরি। সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাভাবনাও বদলায়। সুতরাং মানসিক শক্তি রেখে মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে হবে।

তিনি তাঁর বক্তব্যেরই মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর কথা ও কাজে এক। তাই তো কলকাতা পুলিশের ১৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলা গোয়েন্দা হিসেবে নিজেকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি দায়িত্ব নিলেন 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড'-এর নামে খ্যাত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের। ১৯৯৫-তে আই পি এস হয়ে দময়ন্তী সেনের প্রথম কার্যভার গ্রহণ এ এস পি টাউন হিসেবে এবং যাদবপুরে। কিছুদিন পর দক্ষতার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। পুলিশি প্রশাসনে অত্যন্ত নিষ্ঠা, পরিশ্রম, সততার সঙ্গে কাজ করায় পদোন্নতি ঘটে এবং কলকাতা পুলিশে যোগদান করেন। সেই পদ ছিল বিশেষ গোয়েন্দা প্রধান (২) হিসেবে। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে তিনি এই প্রথম মহিলা গোয়েন্দা প্রধান হলেন দীর্ঘ ১৫৩ বছরের পুলিশের ইতিহাসে।

পুলিশের কাজে এখন অনেক মহিলারাই এগিয়ে আসছেন, যাঁদের কাছে দময়ন্তী সেন এক অনুপ্রেরণা। এই পদে উত্তরণ হয়ে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়া কি প্রশ্নের উত্তরে জানান — "অভিভূত তো বটেই। খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদ এখন। সুতরাং সে দায়িত্ব সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করব।" ঐতিহ্যবাহী পদ হিসেবে একটু বিশদ জেনে রাখা ভাল

এই 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' সম্পর্কে। ১৮৫৬-তে বৃটিশ রাজত্বকালে বৃটিশরা কলকাতা পুলিশ-এর স্রষ্টা। ১৮৬৮-তে স্যার স্টুয়ার্ট হগ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গঠন করেন। স্বাধীনতার অনেক আগে এবং পরবর্তীকালে বহু কুখ্যাত অপরাধের কিনারা করেছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। প্রায় সার্ধশতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই গোয়েন্দা বাহিনী এখন দেশের অন্যতম আধুনিক বাহিনী।

দময়ন্তী সেন কার্যভার গ্রহণ করার পরই দক্ষ গোয়েন্দা হিসেবে বেশ কয়েকটি ঘটনার মূল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। পুলিশি কাজে যুক্ত মানেই কিন্তু তার ভেতরকার মানবিক চেতনা হারাননি। সাধারণ মেয়ে হিসেবে তিনি আর পাঁচজনের মতেই। বাবা মা-র প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতকে করে করে তুলেছেন গৌরবান্বিত।

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ৭

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে চারা তৈরির পেশায় ঝুঁকছেন মহিলারাও

পায়েল বাগচী, ব্যারাকপুর ।। কেন্দ্রীয় সরকারের "জাতীয় উদ্যান পালন মিশন" প্রকল্পে রাজ্যের বেশকিছু জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে মহিলাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফুল-ফলের চারা উৎপাদন হচ্ছে। ২০০৭ সাল থেকে উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর ১-২ পঞ্চায়েত সমিতি, দেগঙ্গা ব্লক ও নদীয়ার বেশ কয়েকটি ব্লকের মহিলারা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই পেশায় এগিয়ে চলেছেন। রাজ্যের জেলা পরিষদগুলি আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করেছে এই কাজে। হাইব্রিড জাতীয় আম্রপালি, মল্লিকা, হিমসাগর ও অ্যানফানসেস আমের চারা তৈরি উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোপাল ও গ্ল্যাডিওলাস ফুলের চারা তৈরি করেছেন মহিলারা। ব্যারাকপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিবদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মহিলা চাষী জানান — সপ্তাহে দু'দিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে চাষীদের, এই চাষে ক্ষতির পরিমাণ কম। আমের চারা তৈরির জন্য ন্যূনতম চারকাঠা জমি হলেই চলবে। চারাগুলো বাজারজাত করার কোনও সমস্যা নেই। উৎপাদিত চারাগুলো ক্রয়ের দায়িত্ব নিয়েছে মিশন নিযুক্ত বেশ কিছু নার্সারি। ব্যারাকপুর ব্লকের প্রশিক্ষক দীপঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, ২০০৭ সালের আগস্ট মাস থেকে রামচন্দ্রপুরের সাথী ও স্বয়ম্ভর দল, বাদুড়িয়ার প্রীতিলতা, বারিকপাড়া মিশন প্রভৃতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৯০ জন মহিলা চাষী প্রশিক্ষণ নিয়ে চারা তৈরির কাজ করে চলেছেন। এদের দেখে আজ অনেকেই এগিয়ে আসছেন। মিশনের মূল লক্ষ্য চাষীদের মূলধন সৃষ্টি করা, যাতে বড় ধরনের চাষের কাজে যুক্ত হতে পারে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলারা।

দুবেলা দুটো রুটি দেওয়া যায় না

(১০ পাতার পর)

চারু মজুমদার কাদের জন্ম দিয়েছেন, হত্যাকারীদের না শান্তির দূত বোরলগদের?

চার বছর আগে, ২০০৫ সালের মার্চ মাসে ডঃ বোরলগ শেষ বার ভারতে আসেন। সে সময় এক বক্তৃতায় উনি করেছিলেন উল্লেখ বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের। Food and Agricultural Organisation (FAO) of the United Nations -এর প্রথম Director General Lord Boyd Orr বলেছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটি লোকও অভুক্ত থাকবেন, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। (বাংলার ও ভারতের Dr. B. R. Sen বহু বছর এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন)

Lord Boyd Orr কিন্তু কখনও বলেননি যে পৃথিবীতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য শ্রেণীশত্রুদের জীবন্ত মুরগীদের মতো মুন্ডহীন করতে হবে। তাঁর, ডঃ বোরলগ, ডঃ স্বামীনাথন ও অন্যান্যরা ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষি বিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন — AK ৪৭-কে নয়। তাই বাংলার ও ভারতের মার্কস্‌বাদীদের কাছে জিজ্ঞাস্য —

ক্ষুধার বিরুদ্ধে সমরে কে বিজয়ী হয়েছেন বা হতে পারবেন — কার্ল মার্কসরা বা নরমান বোরলগরা?

অথ কুয়াত্রোচি কথা

এন সি দে

এক ইতালীয় দ্বারা পরিচালিত দলের সরকার কর্তৃক এক ইতালীয় বেআইনী অস্ত্র কেনাবেচায় অভিযুক্ত দালালের বেকসুর খালাস কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বফর্স ঘুষ মামলায় অভিযুক্ত ইতালীয় দালাল কুয়াত্রোচির এই জামাই আদরের ব্যবস্থা ভারতবাসীর কাছে অপ্রত্যাশিতও নয়। তাই এ নিয়ে হৈচৈও খুব একটা চোখে পড়ছে না। বিরোধী দলগুলো নিন্দাসূচক বিবৃতি দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের কর্তব্য সীমিত রেখেছেন। কমিউনিস্টরা তো না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। কী নরসিংহ রাও সরকার, কী মনমোহন সিং সরকার— সব কংগ্রেস পরিচালিত সরকারেরই চালিত শক্তিই ছিল তারা। তারা বফর্স মামলার বিচার ত্বরান্বিত করে কুয়াত্রোচিকে শাস্তি দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টাই করেনি। কিন্তু এখন কুয়াত্রোচির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে তারা সাততাড়াতাড়ি বিবৃতিও দিয়ে দিয়েছে। তাদের নীতি কিছু নেই। সবটাই কৌশল। বর্তমান কংগ্রেস সরকারে কল্‌কে না পাওয়ায়, এখন তারা সঙ্ঘ-আদর্শে চালিত বি এম এসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। বি এম এসের উচিত ওদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলা। ওদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্যত্র করা যাবে। এখন শুরু করি কুয়াত্রোচির ইতিকথা তথা বফর্স মামলার গতিপ্রকৃতি।

কুয়াত্রোচির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি সুইডিস বন্দুক প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন ভারতে তাদের হাউইটজার বিক্রির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেটি ছিল ১৯৮৬ সালের ঘটনা। সেই সময় ভারতের মসনদে আসীন রাজীব গান্ধী। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ইতালী। কুয়াত্রোচিও ইতালীবাসী। সেই সূত্রে তিনি শ্বশুরবাড়ির লোক হিসেবে রাজীবঘনিষ্ঠ। রাজীব-সোনিয়া পরিবারে তার অবাধ গতি। পরিবারের শ্বশুরও মৃত, শ্বাশুড়ি ও একমাত্র দেওরও নিহত। অতএব গৃহ নিষ্কন্টক।

কুয়াত্রোচি ঘুষ নিয়েছিলেন ৬৪ কোটি টাকা। তার মাধ্যমে এই টাকা কি রাজীব-সোনিয়া পরিবারে প্রবেশ করেছিল? তা জানতেই তো কুয়াত্রোচির সঠিক বিচার হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকারের পুলিশ ও বিচার বিভাগের অধীনে আনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২০ বছরেও তা সম্ভব হল না। আর ভবিষ্যতেও যাতে কেউ আর তা করতে না পারে, তার ব্যবস্থাও সোনিয়ার কংগ্রেস সরকার করে রাখল সি বি আইকে দিয়ে। সোনিয়ার অধীনে সি বি আই পরিণত হয়েছে 'কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন'-এ। এই সি বি আইকে দিয়ে কংগ্রেস সরকারের বিদেশী পরমাত্মা আজ তার নিজ পরিবার ও দলের স্বার্থ চরিতার্থে নেমেছে। ভোটের আগে বেছে বেছে বিজেপির বিরুদ্ধে পুরনো অযোধ্যা কাণ্ড, গুজরাট কাণ্ড, মুসলিম ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী হত্যা কাণ্ডকে গুজরাটের বিজেপি সরকারের সাধারণ মুসলিমদের হত্যাকাণ্ড বলে চালানো। এই সব কাজেই সি পি আইকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ কংগ্রেস যতবারই ক্ষমতায় বসেছে ততবারই কুয়াত্রোচিকে বাঁচানোর প্রয়াস চালিয়ে গেছে নানাভাবে।

১৯৮৬ সালের কেস। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকায় এই বিষয়ে সি বি আই কোনও এফ আই আর দায়ের করেনি। পরিণামে জনগণ ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে। ভি পি সিং সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯০ সালের ২২ জানুয়ারি সি বি আই এফ আই আর দাখিল করে উইন চাড্ডা, কুয়াত্রোচি এবং রাজীব গান্ধীর নামে। কিন্তু অ-কংগ্রেসী ভি পি সিং সরকার বেশিদিন টিকতে পারেনি

তার অপকর্মের জন্য। বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুত্বের গতিরোধ করতে তিনি হিন্দু সমাজকে ভাঙতে 'মণ্ডল কমিশনে'র জাতপাতের ঝাঁপি খুলে বসলেন। বিজেপি সঙ্গে সঙ্গে ভি পি সিংকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামায়। কিন্তু পরিণতি বিজেপির পক্ষে যায়নি। জাতপাতের সংকীর্ণ গলি থেকে বেরিয়ে আসে লালু-মুলায়ম-কাঁসিরাম-মায়াবতী নামক সরীসৃপের দল। তাদের দংশনে হিন্দু সমাজের দেহে যে বিষ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তা শুষে নেওয়ার মতো কোনও নীলকণ্ঠ আজও আমরা পাইনি। এরই মধ্যে ঘটে যায় রাজীব হত্যা ষড়যন্ত্র। সহানুভূতির ঝড়ে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসে ১৯৯১ সালে।

ফল যা হওয়ার তাই হল। বফর্স ঘুষ মামলায় আবার যবনিকাপাত হল। ১৯৯০ সালে যাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হল, তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার সময়টুকুও পায়নি নরসিংহ রাওয়ের কংগ্রেস সরকার পাঁচ বছরে। কংগ্রেস সমর্থিত দেবেগৌড়া ও গুজরাল সরকারও সোনিয়াকে চটানোর পথে যায়নি। ৯০-এর জানুয়ারির এফ আই আর-এর প্রায় ১০ বছর পর ১৯৯৯ সালের অক্টোবরের ২২ তারিখে বিজেপি সরকারের আমলে আবার এই তিনজনের নামে চার্জশিট দেওয়া হয়। ২০০০ সালের অক্টোবরে চাজশিট দেওয়া হয় হিন্দুজাকে। বাজপেয়ী সরকারের একেবারে শেষে নির্বাচনের মুখে ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ দিল্লী হাইকোর্ট রাজীব গান্ধীর নাম বাদ দিয়ে দেয়।

২০০৪ সাল থেকে পুনরায় কংগ্রেস সরকার। শুরু হয় বফর্স মামলা লঘু করার চক্রান্ত। কুয়াত্রোচিকে রক্ষা করার প্রক্রিয়াও। ২০০৪ সালে দিল্লী হাইকোর্ট বলতে বাধ্য হল যে, বফর্স লেনদেনে দুর্নীতির কেসই করা হয়নি। ২০০৫ সালের মে মাসে হিন্দুজা ভাইদেরও মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধেও সি পি আইকে আপিল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সি বি আইয়ের আচার-আচরণেও দেখা যায় গয়ংগচ্ছ ভাব। প্রথমেই কুয়াত্রোচির লণ্ডনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বফর্স ঘুষের টাকা তুলে নেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুয়াত্রোচি আর্জেন্তিনায় ধরা পড়ে ইন্টারপোলের নোটিশের ভিত্তিতেই। আর্জেন্তিনা সরকার কুয়াত্রোচিকে ভারতের হাতে প্রত্যার্পণের বিরোধিতা করে। সঙ্গে সঙ্গে সি বি আইকে আপিল করতেও বাধা দেয়। এর আগে জানুয়ারি ২০০৬ সালে অ্যাডভোকেট অজয় অগ্রবাল সুপ্রিম কোর্টে কুয়াত্রোচির লণ্ডন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সি বি আইয়ের কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তাতে। কুয়াত্রোচির সম্পর্কে এই জামাইসুলভ আচরণের শেষ প্রমাণ ২০০৮ সালের ২৫ নভেম্বর রেড কর্ণার নোটিশ প্রত্যাহার। ২০০৯ সালে এসে একেবারে পুরোপুরি কেসটাই তুলে নেওয়া হল।

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটাই বলা যুক্তিযুক্ত যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস চালিত সরকারগুলি মূলত কুয়াত্রোচিকে বাঁচানোর প্রক্রিয়াই চালিয়ে গেছে। প্রায় দুই দশক পরে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেন্দ্রের কংগ্রেসের সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কুয়াত্রোচির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৬৪ কোটি টাকার ঘুষ ধরতে কংগ্রেস সরকার করদাতাদের কষ্টের কত কোটি টাকা এভাবে নয়ছয় করল তা কি সরকার সংসদে জানাবে? না কি জনগণকেই আর টি আই অ্যাক্ট মোতাবেক দাবি জানাতে হবে? অবশ্য একদিকে ভালই হল। এবার আর সি বি আইয়ের আমলারা মামলার নাম করে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না কথায় কথায়। এবার কেবল অপেক্ষা করা কুয়াত্রোচিকে মালা পরিয়ে জামাই আদরে সোনিয়ার সরকার কবে এদেশে নিয়ে আসে!

হোয়াইট হাউসে দীপাবলী পালন করলেন ওবামা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবারকার দীপাবলীতে ভিন্নমাত্রা যোগ করলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন। হোয়াইট হাউসে ওবামা এবং লণ্ডনে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের বাসভবনে গর্ডন ব্রাউন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের

প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলী উৎসব পালন করছেন ওবামা।

পৌরোহিত্যে প্রদীপ জ্বালালেন। বৈদিক মন্ত্রে বিশ্ব শান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়। ওবামা বলেছেন, "আমি মনে করি, এই দীপাবলীর ছুটি আলোর উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীতে মহান ধর্মবিশ্বাসের অনুগামীরা দুষ্টের উপর শুভশক্তির জয়ের প্রতীক হিসেবে পালন করেছেন।" হোয়াইট হাউসের ঐতিহাসিক ইস্ট রুমে দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওবামা এই মন্তব্য করেন। গত ১৫ অক্টোবর ওই অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, আগামী শনিবার ছুটির দিনে আমেরিকা এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বসবাসকারী হিন্দুরা (জৈন, শিখ ও বৌদ্ধ) প্রদীপ বা বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকারের উপর আলোর জয়, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের হিসেবে দীপাবলী উৎসব পালন করবেন।

অনুষ্ঠানে ওবামা ছাড়াও আমেরিকার কয়েকজন সচিব, সেনেটের, ইন্দো-আমেরিকান সদস্য এবং ভারতের বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী আনন্দ শর্মা ও আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মীরা শঙ্করও উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের ঠিক আগে ওখানকার শিব-বিষ্ণু মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত নারায়ণাচার্য বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন।

অন্যান্য ধর্মের অনুগামী অনেকে সপরিবারে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউস আলোক সজ্জায় সাজানো হয় এবং উপস্থিত আমন্ত্রিতদের মিষ্টি সহযোগে আপ্যায়ণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট ওবামার বক্তব্য ছিল, 'আমি দীপাবলী উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে প্রদীপ জ্বালিয়ে খুব খুশী এবং সকলকে দীপাবলী উপলক্ষে শুভ কামনা জানাই।

এদিনই রাষ্ট্রপতি ওবামা এশিয়া-আমেরিকান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য এক উপদেষ্টা কমিশন গঠনের আদেশে হস্তাক্ষর করেন।

এক ব্যক্তিগত মন্তব্যে লিখিতভাবে ওবামা জানান, এশিয়া-আমেরিকান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্প্রদায়ের মূল নিবাসীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। তাদের বৈচিত্র্যে বনেদীয়ানা এবং বর্তমানের সাফল্যের নিদর্শন আমেরিকায় উপস্থিতি রয়েছে।

খেলার জগৎ

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার বিজেন্দারের স্বীকৃতি

।। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

অলিম্পিকের পর মিলান বিশ্ব চাম্পিয়ানশিপেও ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে বিজেন্দার সিং জাতীয় বক্সিংকে আবার গৌরবান্বিত করলেন। আর এই পদক জেতার পরপরই বিশ্ব বক্সিং ফেডারেশন বিজেন্দারকে তার নিজের ক্যাটাগরি অর্থাৎ ৭৫ কেজি বিভাগ— যা কিনা মিড্‌লওয়েট ক্যাটাগরি, তাতে এক নম্বর বক্সারের স্বীকৃতি দিলেন। বিশ্ব পর্যায়ে এক নম্বর তাও বক্সিংয়ের মতো কঠিন ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা একটি খেলায়; এই উচ্চতায় ওঠার গৌরব এবং মর্যাদাই অন্যরকম। মিডিয়ার একচোখামিতে অবশ্য সাধারণ মানুষ এর গুরুত্ব ঠিক অনুধাবন করতে পারেনি।

বিশ্বনাথন্ আনন্দের মতো বিজেন্দার সিং বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের শ্রেষ্ঠ বাজি। দাবার মতোই বক্সিং বিশ্বজনীন খেলা। দুই বিশ্বসেরা ভারতীয় অবশ্য তাদের নিয়ে মিডিয়া ও জনসাধারণের ভাবনা কী তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। তাদের লক্ষ্য অনেক বড় ক্যানভাস। গোটা বিশ্ব তাদের সেলাম জানাচ্ছে। দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা তাদের নিয়ে আলোচনা করছে। ভারতবর্ষ কি ভাবল বা কি দিল তা নিয়ে তাদের চিত্ত উদ্বেল হয় না। বিশ্বনাথন আনন্দের একমাত্র লক্ষ্য ফিডে এলো রেটিংয়ে ববি থিকার ও গ্যারি কাসপারভ— দুই চিরস্মরণীয় কিংবদন্তীকে টপকে যাওয়া ও সর্বকালের সেরা গ্রাণ্ডমাস্টারের তকমা অর্জন করা। আর বিজেন্দারের লক্ষ্য অলিম্পিক স্বর্ণপদক জেতা।

আনন্দ অবশ্য অলিম্পিক সোনাটিকে পাখির চোখ করেছেন। বিশ্ব খেতাব, অস্কার পুরস্কার, সব ধরনের বড় মাপের খেতাব জেতা হয়ে গেছে তার। অলিম্পিক প্রদর্শনী সোনাটিও তার করায়ত্ত। ২০১৬ সালের অলিম্পিকে দাবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অলিম্পিক সোনাটি জিতে দাবাকে বিদায় জানাবেন আনন্দ। অন্যদিকে বিজেন্দার-এর লক্ষ্য বেজিং অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে পোডিয়ামে গিয়ে দাঁড়ানো। ঝকঝকে, সুদর্শন হরিয়ানভি তার ব্যক্তিত্ব ও ক্যারিসমা দিয়ে গোটা দুনিয়ার নজর টেনে নিয়েছেন। বিরাট অঙ্কের এনডোর্সমেন্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধও হয়েছেন। বছরে ৪৫ কোটি টাকার এনডোর্সমেন্ট তার বক্সিংকেই আরও সমৃদ্ধ করবে।

বলিউডি সিনেমায় অফারও রয়েছে তার। তবে তার কোচ তাকে সঠিকভাবে গাইড করছেন। এখনই বিজ্ঞাপন বা

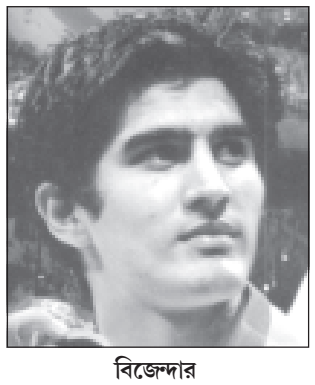

বিজেন্দার

সিনেমায় অভিনয় করতে দিয়ে তার মাথা ঘুরিয়ে দিতে চান না ভারতীয় ও কিউবান কোচ। তার ওপর যে অনেক আশা ভারতীয় ক্রীড়া সমাজের। বিজেন্দার ও অখিল কুমারই যে ভারতীয় বক্সিংয়ের সেরা আশা ভরসা। অখিল বেজিংয়ে একটুর জন্য পদক পাননি। তারও বিশ্ব পর্যায়ে সোনা জেতার মতো দক্ষতা আছে। আর বিজেন্দার মনে করেন, তার দৌড় ব্রোঞ্জ জেতার মধ্যেই থেমে যাবে না। লণ্ডন অলিম্পিকে দেশকে সোনা দিয়েই রিংকে গুডবাই জানাবেন। তবে বিজেন্দার ও অখিলকে মনে রাখতে হবে, কথা কম, কাজ বেশি— প্রবাদবাক্যটি। দু'জনেই রিংয়ে নেমে বড় মাপের সাফল্য পেলেই মিডিয়ার সামনে অনেক বেশি আত্মম্ভরতা দেখিয়ে ফেলছেন। এ ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে। বিশ্ব বক্সিং এখন অনেক বেশি পেশাদারী কূটনীতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোড়কে ঠাসা কঠিন রণক্ষেত্র। সব বক্সারই দেহ-মনে ও টেকনিক্যাল দিক থেকে শাণিত ও পরিশীলিত হয়ে রিংয়ে নামে। লড়ার আগে অযথা টেনশন বাড়িয়ে লাভ কি?

তবে অলিম্পিক বা বিশ্ব মিটে সোনা না পেলেও যে কীর্তি স্থাপন করেছেন বিজেন্দার তাই বা কম কিসের? সোনা না জিতেও এক নম্বর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বিজেন্দার। অনেক মহিলা টেনিসের দিনারা সাফিনার মতো যিনি কিনা কোনও গ্রাণ্ডস্লাম না জিতেই বেশ কয়েকমাস ট্যুর সার্কিটে এক নম্বর ছিলেন। শারদীয়ার মাহেন্দ্রক্ষণে বিজেন্দারের এই স্বীকৃতি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে অতুলনীয় আনন্দও গর্ব করার অবকাশ দিয়েছে। এই গর্ব ও আনন্দকে ধরে রাখার নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে বিজেন্দারের। পরের বছর এশিয়াড ও কমনওয়েলথ গেমসের সোনা জিতে তার বীরত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হবে ২০১২ সালের অলিম্পিক সোনা।

সুভাষ ভৌমিক কি ফুরিয়ে গেছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসিয়ান জয়ী কোচের হলোটা কি? মোহনবাগানের কাছে খেতে হলো পাঁচ গোল! যার পরিণামে শেষপর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল কোচের দায়িত্বভার থেকে পদত্যাগ। আসলে নতুন করে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার পর তার কোচিংয়ে সেই ঝাঁঝটাই পাওয়া যায়নি। সুভাষ ভৌমিক মানে বিশেষ কিছু চমক, আলাদা করে চিনে নেওয়ার মতো কোচিং উৎকর্ষতা এই ব্যাপারটাই যেন উবে গেছে। মরসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট আই এফ এ শিল্ডে চূড়ান্ত ভরাডুবির পর ভাবা গিয়েছিল, দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপে ঘুরে দাঁড়াবে লাল হলুদ ব্রিগেড। আম্বেদকরের মাঠেও সুভাষ ইস্টবেঙ্গলের মশাল জ্বালাতে ব্যর্থ।

জাতীয় লিগে ইস্টবেঙ্গল এখনও জয়ের মুখ দেখেনি। মাহিন্দ্রা ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হার ও পুনে এফ সি, মুম্বাই এফ সি-র সঙ্গে ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ সুভাষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল ক্লাব তাঁবুর আনাচে-কানাচে। লাখো লাখো ইস্টবেঙ্গল সমর্থক আস্থা হারাচ্ছিলেন সুভাষের ওপর। ক্লাব সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রণব দাশগুপ্ত সুভাষকে আড়াল করে রেখেছিলেন যাবতীয় অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ঝড় থেকে। ক্লাব কর্তাদের গরিষ্ঠ অংশের সমর্থন ও আস্থা হারিয়েও তাই সুভাষ টিকে ছিলেন, তবে মোহনবাগানের কাছে পাঁচ-তিন গোলে হারার পর তাঁর বিদায় একপ্রকার নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল।

পাঁচ বছর আগে তাঁর কোচিংয়েই শেষবার জাতীয় লীগ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। তখন ইস্টবেঙ্গলের সুসময় চলছে। জাকার্তার মাটি থেকে আসিয়ান কাপ জিতে আসার পর সুভাষ তখন ভারতীয় ফুটবলে ভি আই পি কোচ। দেশের সব বড় ক্লাব তাকে ডাকছে। ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেক বেশি টাকার অফার নিয়ে হাজির মাহিন্দ্রা, ডেম্পো, জে সি টি। কিন্তু পাক্কা ইস্টবেঙ্গলি সুভাষ সেসব অফার ফিরিয়ে দিয়ে লাল-হলুদ জনতার নয়নের মণি তখন। আসিয়ান জাতীয় লীগ জিতেও এ এফ সি কাপেও দু-তিনটি শক্তিশালী টিমের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে ইস্টবেঙ্গল তখন

সুভাষ ভৌমিক

ভারতীয় ফুটবলের মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সুখের সময় বড় ক্ষণস্থায়ী। পরের বছর থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে দল ও কোচের। কয়েকমাস পরেই সুভাষকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর সুভাষ জড়িয়ে পড়েছেন সি বি আই কর্তাদের সঙ্গে হাতাহাতি ও ঘুষ কেলেঙ্কারিতে। একদা বড় মাপের খেলোয়াড় পরবর্তীতে হাই প্রোফাইল কোচ সুভাষ মাঠের মতো ব্যক্তিজীবনেও বেপরোয়া ও দুর্বিনীত। সি বি আই তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া ও অফিসারদের মারধরের অভিযোগে মামলা রুজু করে কয়েকদিনের জন্য জেলে পাঠিয়ে দিলেও ওপর মহলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান সুভাষ। আর ক'দিন আগে আদালত তাঁকে এই মামলায় নির্দোষও ঘোষণা করে। এসব ঘটনা তার শরীর ও মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও সুভাষ তার স্বভাবসিদ্ধ আবেগ ও অহংসর্বস্ব ইগোটিকে নষ্ট হতে দেননি। মরসুমের শুরুতে দল নিয়ে পুরীতে গিয়ে সী-বিচ ও জলে গিয়ে কোবরা ট্রেনিং করে এসে সাংবাদিকদের বুক ফুলিয়ে বললেন, এবার ইস্টবেঙ্গলকে দেখা যাবে অন্য রূপে। মায়ানমারে প্রস্তুতি ম্যাচে তার প্রতিফলন দেখা গেলেও শিল্ড, ডুরাণ্ড, জাতীয় লীগের ছবিটা ভিন্ন।

পরপর ম্যাচে ব্যর্থতার পর সুভাষও খানিকটা চুপসে গিয়েছিলেন। আগের মতো সপ্রতিভ, ডাকাবুকো মেজাজটা লুকিয়ে রেখেছেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে। গুরু পি কে ব্যানার্জী যেমন কোচিং জীবনের শেষপর্বে এসে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার সমীকরণটি, ভাবশিষ্য সুভাষও হয়ত তেমনটাই উপলব্ধি করেছেন। শুধু ভোকাল টনিক বা ম্যান ম্যানেজমেন্টের ওপর ভরসা করে পরিবর্তনশীল ফুটবল দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। আধুনিক ফুটবলে সফল কোচ হতে গেলে আরও অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। পিকের মতো সুভাষও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছেন। যদিও আধুনিক বিশ্ব ফুটবল সম্পর্কে খানিকটা হলেও ওয়াকিবহাল সুভাষ। নিয়মিত ঘষামাজা করেন। ইন্টারনেট সার্চ করেন। তবে মাঠে নেমে কোচিং করাতে গেলে শুধু তত্ত্বদর্শী হলেই চলবে না। স্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিস, গেম রিডিং ও পরিস্থিতি অনুযায়ী চিন্তা-চেতনার 'সুইচ ওর্ডার' ব্যাপারগুলো ঠিকমতো ক্লিক করল না সুভাষের।

ভারতীয় ফুটবলের বর্ণময় চরিত্র সুভাষ ভৌমিক কি ফুরিয়ে গেলেন?

শব্দরূপ - ৫২৪

কাশীনাথ আঢ্য

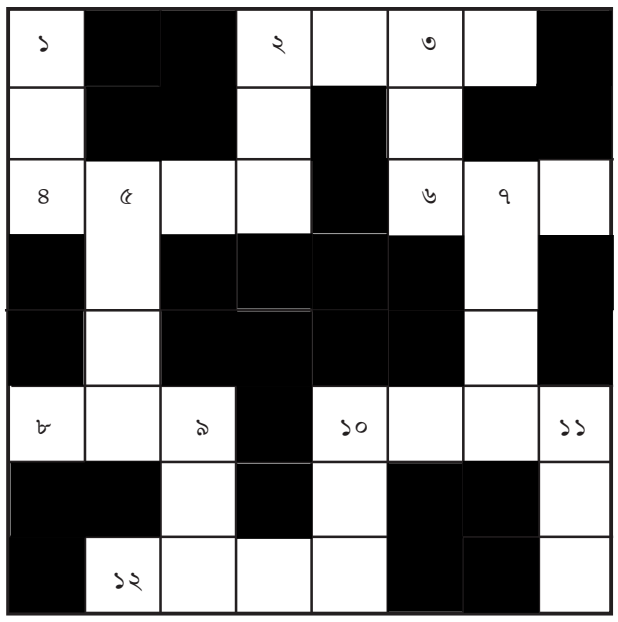

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. মহাদেবের অমোঘ অস্ত্র ত্রিশূল, ৪. বিশেষণে কাঁটাযুক্ত, বিঘ্নসঙ্কুল, ৬. মহর্ষি সত্যকামের মাতা, ৮. চণ্ডিকাদেবীর এক রূপবিশেষ প্রথম দুয়ে মসি, ১০. প্রতিশব্দে আরামদায়ক, শেষ দুয়ে বিশেষণে বহনকারী, ১২. অন্যনামে চাঁদ, মধ্যে ইঙ্গ পেয়ালা।

উপর-নীচ ঃ ১. শিবের বাসস্থান রূপে বর্ণিত হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্বত বিশেষ, ২. তৎসম শব্দে আগুন, অগ্নি, প্রথম ঘরে ঠ্যাং, ৩. পদ্মফুল, প্রথম দুয়ে কাদা, ৫. পৌরাণিক যুদ্ধ কাহিনীমূলক ভারতীয় নৃত্যবিশেষ, ৭. মুনিবিশেষ, প্রথম দুয়ে ডান এর বিপরীত, শেষ দুয়ে ঈশ্বর, ৯. কশ্যপের স্ত্রী, আগাগোড়া পিতৃব্য, প্রথম দুয়ে সময় ১০. ধ্রব জননী ও রাজা উত্তান পাদের প্রথমা স্ত্রী, প্রথম ঘরে শুভ, ১১. এই লুট, সংকীর্তনের পর প্রসাদি বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

সমাধান শব্দরূপ ৫২২

■	জ	মা	ট	■	স	■	■
■	■	ন	■	■	ম	রি	চ
বা	■	চি	ন	চি	ন	■	র
ল	ঘি	ত্র	■	ত্তে	■	■	ণ
গো	■	■	রা	■	ক	লা	প
পা	■	প	ই	প	ই	■	দ্ম
ল	গু	ড়	■	■	স	■	■
■	■	শি	■	ত্ব	র	ণি	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী, কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল, নলহাটী, বীরভূম।
সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫২৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ নভেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়

সংখ্যালঘু তোষণ

(৩ পাতার পর)

যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায় নইলে কিছুতেই কোনওদিন কল্যাণ হবে না।" এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান অম্লান। সারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি হিসাবে স্বীকার করে না। যারা লোকসভায় বন্দেমাতরম গান গাইতে দেয় না যারা দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মকে "পর্নোগ্রাফিক" (হিন্দুত্ব ও ইসলাম বইয়ে উদ্ধৃত লেখক মুরতাহিন বিল্লাই ফজলি) গালি দেন, আজও তাদেরকেই ভোটের লোভে তোষণ করা তথা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।।

মানুষকে সব ভুলিয়ে দাও.... গুলিয়ে দাও

বিশাখা বিশ্বাস

ভুলিয়ে দাও .... গুলিয়ে দাও। ....

নানুর - সূচপুর - গড়বেতা - ছোট আঙাড়িয়ার বীভৎস সেই সব ভয়ঙ্কর ইতিহাস ভুলিয়ে দাও ... সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সেইসব খুন-ধর্ষণ-গৃহদাহ ও উচ্ছেদের ইতিবৃত্তকে সব গুলিয়ে দাও ... বৈদিক ভিলেজের মোদী-বিশ্বাস-গফফর মোল্লাদের দ্বারা কৃষকের জমির নির্বিকার লুণ্ঠনকে আড়াল করো .... লালগড়ের আদিবাসীদের বুভুক্ষার ইতিকথাকে যৌথ অভিযানের নামে পুলিশী বুটের তলায় পিষে মারো।.... না, দেখেশুনেও সত্তরের দশকের ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলিকেই আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে বুদ্ধিজীবীরা যেন ভেবো না, ভাবলেও কদাচ তা প্রকাশ করো না — কেননা, আইন আইনের পথেই চলবে।'.....

বৈদিক কান্ডের গৌর-লুইসেরা হাতে ও মাথায় লাল রিবন বেঁধে বিধায়ককে সাথে নিয়ে জমি লুটের এ্যাকশনে নামতো। সেখানকার মোদী-বিশ্বাস-গফফর মোল্লারা মন্ত্রী রেজ্জাক-গৌতম এমনকি ভশ্চাজ সাহেবের যোগসাজসেই প্রমোটারদের জন্যে বুলডোজার চালিয়ে বারো হাজার একরেরও বেশি জমি লুণ্ঠন করেছিল। সেখানে ভয়ঙ্কর সব বোমা-বারুদ-কার্তুজ সহ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র খোদ পুলিশই উদ্ধার করেছিল এবং মমতা ব্যানার্জী তাই অভিযোগ করতেন যে, সেগুলি নাকি সরকারের অস্ত্রাগার থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। বেগতিক বুঝে গৌতম -রেজ্জাক সাহেবেরা যখন আপন আপন পিঠ বাঁচাতে পরস্পর-বিরোধী কথা বলছিলেন, স্বরাষ্ট্র সচিব, মুখ্যসচিবেরা যখন ভিন্ন ভিন্ন স্বরক্ষেপণ করে চলছিলেন — কথায় কথায় পুশকিন-ব্রেখ্‌ত-মায়াকোভস্কি আউড়ানো ফুলের প্রেমিক সেই নাটুকে নটবরকে তখন তাই সাময়িকভাবে মুখে লাগাম চাপিয়ে পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

১৯৯৩ সালে বৌবাজারে সেই বোমা-বিস্ফোরণের মোকদ্দমায় সি পি (আই) এম নেতা-মন্ত্রীদের নাম ফাঁস করে দিয়ে পার্টিকে সেই সুসময়েও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল সেই মাফিয়া ডন রশিদ খাঁন। আজ ২০০৯ সনের এই ঘোর দুঃসময়ে জেলখানায় বসে

“এই সরকারের ছিলাম মিত্র হলেম শত্রু” - বলে অভিযোগ করেছেন রাজকুমার মোদী নামক জমি লুণ্ঠনের সেই মালিক মহাজন। সত্যি, ‘পৃথিবীর সব ঘটনাই দুইবার আবর্তিত হয়।'...

না, নাটুকে রাজার নাটক নয়, দলীয় ইতিহাসে এখন সত্যি করেই ‘দুঃসময়’। সেই যে সেদিন পঞ্চায়েতে জয়ের গতি ব্যাহত হল, তারপর স্কুল-নির্বাচন থেকে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে পরাজয়, নানান জাতের উপনির্বাচন থেকে খোদ লোকসভার নির্বাচনে পরাভব, এমনকি দলের সেই পুষ্পবিলাসী সাংস্কৃতিক মুখ্যমন্ত্রীকেও ‘টাটাবাবা’-র পরিত্যক্ত সিঙ্গুর ছেড়ে, নন্দীগ্রামে লেজের আগুনে নিজের মুখ পুড়িয়ে, মংপুর বাংলোয় থেকে সস্ত্রীক শিলিগুড়ির পৌর নির্বাচনে পুচ্ছদেশের গো-বিষ্ঠা নিজের মুখে মাখিয়ে মূক ও বধির সেজে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হচ্ছে।....

কাজেই সবই গুলিয়ে চলেছে।

“তসলিমার বইখানাকে এরাজ্যে নিষিদ্ধ করে যিনি লেখিকাকে রাজ্যছাড়া করেছিলেন, দেশছাড়া করিয়ে নিয়েছিলেন, কপালদোষে তাকেই আজ গুজরাটে যশোবন্তের রচনায় মোদীর নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করতে হচ্ছে। রাজা হবুচন্দ্র হলে তার সান্ত্রীকেও গবুচন্দ্র হতেই হয়।”

তসলিমার বইখানাকে এরাজ্যে নিষিদ্ধ করে যিনি লেখিকাকে রাজ্যছাড়া করেছিলেন, দেশছাড়া করিয়ে নিয়েছিলেন, কপালদোষে তাকেই আজ গুজরাটে যশোবন্তের রচনায় মোদীর নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করতে হচ্ছে। রাজা হবুচন্দ্র হলে তার সান্ত্রীকেও গবুচন্দ্র হতেই হয়। তাই বৈদিক ভিলেজের ক্ষেত্রে ধৃতদের একটি বিবৃতি যে রাজার সান্ত্রীরা তদন্তের স্বার্থে প্রকাশ করেননি, বিধির বিধানে আজ তাদেরই লালগড়-কান্ডে ছত্রধরের বিবৃতির বুনিয়াদে বুদ্ধিজীবিদের চমকে দিতে হচ্ছে। হা ঈশ্বর!...নাহ্ চাল ডাল, তেল, চিনি যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দর ঊর্দ্ধাকাশে ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করেছে। যে বামফ্রন্ট সরকারটি বত্রিশ বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কালাকানুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছিল, ক্ষমতায়নের পর সেই সরকারেরই প্রশাসনে দুরপনেয় দুর্নীতি এবং সমাজের সর্বাঙ্গে বল্গাবিহীন ব্যভিচার ছড়িয়ে দিয়ে সরকারটা আজকে এখন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ এবং রবিশঙ্করের যুগলবন্দির মতো সেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরমের সাথে যুগলবন্দি হয়ে দিল্লীর সেই কুখ্যাত বামপন্থীদের বহু নিন্দিত নিবর্তন মূলক আইনকে এরাজ্যে গ্রহণ না করেই তাকে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিগণের ওপর প্রয়োগ করে চলেছে। লক্ষ্য পরিস্কার; মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত রূপান্তর সাধনে ব্যর্থতার কথা আড়াল করো — সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-রাজারহাট কান্ড সহ সমস্ত সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলির পরাভবকে আড়াল করে ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে জনগণের নজর থেকে সরিয়ে রাখো.... মানুষকে সর্বত্র সব কিছু ভুলিয়ে দাও, সব কিছু গুলিয়ে দাও, চমকে দাও....।

বারাসাতে বিজয়া সম্মেলন

গত ১১ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের পঞ্চানন ভবনে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলন। স্তোত্রপাঠ ও ভক্তিগীতির

মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিদের চন্ডীপাঠ করে শোনান অনুষ্ঠানের সভাপতি শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, দেবী দুর্গার বন্দনা মন্ত্রওপাঠ করা হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রবীর বিকাশ চৌধুরী। বিজয়া সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সভাপতি তথা বনগাঁ স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক সুকুমার নাথ। বিভিন্ন স্থান থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি উৎসবে অংশ নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের বারাসত মহকুমা কার্যবাহ অরুণ কুমার দাস।

প্রয়াত মণিভূষণ চক্রবর্তীর শোকসভা

গত ১৪ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের কার্যালয় — কেশব স্মৃতিতে প্রয়াত অধ্যাপক মণিভূষণ চক্রবর্তীর শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ অক্টোবর অধ্যাপক মণিভূষণ চক্রবর্তী ৭০ বছর বয়সে হাওড়ার শেখপাড়া লেনের বাড়িতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও অবিবাহিতা তিন কন্যাকে রেখে গিয়েছেন। মণিবাবুর জন্ম ১১ অক্টোবর, ১৯৩৯ সালে বাংলা দেশের কুমিল্লা জেলায়। পিতা অন্নদাচরণ চক্রবর্তী ও মাতা বিনোদিনী চক্রবর্তী স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তিনি হাওড়ায় এসে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (মেন) বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম পাশ করে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) স্কুলে শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের একজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক। পরে অধ্যাপক হিসেবে আন্দুল কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি শিবপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ ও বিজেপি পরিবার গভীর শোক জ্ঞাপন করেছে। এদিন ভগবদ্ গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত মণিভূষণ চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিচারণ করেন বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সৌমেন চক্রবর্তী, সঞ্চয় মুখার্জী, সঞ্জিত দে, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুধীর ব্যানার্জী প্রমুখ। সভাশেষে সকলে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করেন। ১৮ অক্টোবর তাঁর শিবপুরের বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহাষষ্ঠীর দিন ‘দেবদূত’-এর পথশিশুদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জয়ন্ত সেন। মঞ্চে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমৎ স্বামী মন্ত্রাত্মানন্দ মহারাজ, ডঃ বিজয় আঢ্য প্রমুখ।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

গত ১০, ১১ অক্টোবর — দুই দিন ব্যাপী মেদিনীপুরের নছিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্মেলনে বনবাসী সমাজের স্বার্থে কল্যাণ আশ্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উঠে আসে। সেই সঙ্গে বনবাসী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ওপর কল্যাণ আশ্রমের কার্যসূচীরও একটা রূপরেখা গড়ে উঠে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের থানা সমিতির সভাপতি পরিমল ভক্তা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম) জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা। কল্যাণ আশ্রমের মেদিনীপুর জেলা সভানেত্রী বেলা মজুমদার, ক্ষেত্রীয় খেলকুদ প্রমুখ প্রবোধ নন্দ, গ্রাম বিকাশ প্রমুখ নগেন্দ্র নাথ উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনের এই সম্মেলনে পঞ্চাশেরও ওপর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মহিলা প্রতিনিধিরাও এতে অংশ নেন। প্রেমানন্দ হাঁসদার নেতৃত্বে বনবাসী নাচ-গান সকলকে বিশেষ আনন্দ দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কল্যাণ আশ্রমের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সহ-ক্রীড়া প্রমুখ মঙ্গল মুর্মু।

কল্যাণ আশ্রমের ‘বনযাত্রা’

প্রতি বছরের মতো এবারও ‘বনযাত্রা’ উৎসব উপলক্ষে গত ৪ অক্টোবর কল্যাণ আশ্রমের হাওড়া মহানগর সমিতির সদস্য-সদস্যারা কালিম্পং-এর কল্যাণ আশ্রম দেখে রীতিমতো অভিভূত হন তাঁরা। সেই সঙ্গে তাঁরা লাভা-মেনেস্ট্রী-লোলেগাঁও, মাম্বলিংসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন। গ্রামের মানুষরাও সদস্য-সদস্যাদের কাছে পেয়ে আনন্দিত হন। কালিম্পং-এর পূর্ণকালীন কার্যকর্তা ফুলছিরিং নেপচা সেখানের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখান। তবে কালিম্পং-এর প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে ব্যথিত হন আশ্রমের কার্যকর্তারা। সেখানকার অনগ্রসর গ্রামের পরিস্থিতিও তাদের মন ভাবিয়ে গেলে। ৮ অক্টোবর সদস্য-সদস্যারা ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন সেখানকার আলো-বাতাস-এর স্পর্শ, আর সেখানকার মানুষের বুকভরা ভালোবাসা।

Swastika
2 November - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

গুহানগরী মুম্বাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুম্বাইয়ের মতো মেট্রো শহরের পরিচয়টা কি হতে পারে? শুধু কি বড় শহর, নাকি লোকাল ট্রেনের কামরা ভর্তি এক এক মেট্রোপলিটান! না, এর বাইরেও কিন্তু মুম্বাই হয়। যেখানে মেট্রো শহরের গতানুগতিক চিত্রটা হয়তো দেখা যাবে না, কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখা যাবে ইতিহাসের সেসব গিরি-গুহাগুলিকে। মুম্বাই শহরের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে হরেক প্রকৃতির ঐতিহাসিক গুহা। এইসব গিরি-গুহা মুম্বাইবাসীকে অতটা আকর্ষণ না করলেও, দেশে ইতি-উতি থেকে অনেকেই এসব দেখতে আসেন। মা-ঠাকুরমার কোলে বসে শোনা গুহা জগতের কল্প কাহিনীর সঙ্গে অনেকে এখানে মিল খুঁজে পান। বিশ্বের মধ্যে সম্ভবত মুম্বাই একমাত্র শহর, যেখানে এত বেশি মাত্রায় গুহা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এত প্রাচীন গুহার সন্ধানও অন্য কোথাও এতটা পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের অতলগর্ভে এখনও এসব বৃহৎ গুহাগুলি তলিয়ে যায়নি। একথা ঠিক যে সেভাবে গুহার রক্ষণা-বেক্ষণ হয় না। স্থানীয় বাসিন্দারাও এর মূল্য বোঝেন না। অনাদর-অপরিচর্যার অভাব বরাবরের। বিশেষ করে যোগেশ্বরী ও মণ্ডোপেশ্বর গুহা-মন্দির পরিচর্যাহীনতার সর্বাধিক শিকার। গুহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির অবস্থা গুহার থেকেও বেশি করুণ। কালের প্রভাবে, সংরক্ষণের অভাবে জীর্ণ অবস্থা সে সবের। এর ওপর রয়েছে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো অবৈধ বাড়ি-ঘরদোর। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একাধিক পাকা বাড়ি। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শত শত মানুষ অবাধে জীবন-যাপন করছেন। মন্দিরগুলির অবস্থা? রাখালের হাতে শালগ্রাম শিলা থাকলে যা হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গুহার চারপাশে জমে ওঠে আবর্জনার স্তূপ। ২০০৫ সালে এই অনাদরের চিত্র হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। 'জনহিত মঞ্চ' হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলে, কোর্ট ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিই গুহাগুলির রক্ষণা-বেক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠে। কমিটি যোগেশ্বরী, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি গুহাগুলি ঘুরে দেখেন। এখানে উল্লেখ্য, এইসব গুহা প্রায় ৫২০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি। এই সমস্ত গুহাগুলিই প্রথম পাথর কেটে তৈরি বলে জানা যায়। এই গুহার কাজে ব্যবহৃত গম্বুজগুলিরও ঐতিহাসিকদের কাছে আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক ডঃ ওয়ালটার স্পিঙ্ক যোগেশ্বরী মন্দিরকে ভারতের প্রথম গুহা-মন্দির বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু বর্তমানে এই মন্দিরের অবস্থা ভালো নয়। ড্যাম্প ধরেছে মন্দিরের গায়ে।

১৮৮২ সালে থানে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটে মন্দিরের অনেক বর্ণনাও নজরে পড়ে। মন্দিরের গুহাগাত্রগুলি ছিল যথেষ্ট সৌন্দর্যপূর্ণ। কালো পাথর কেটে গুহাগাত্রে হরেক রকম নক্সা কাটা হয়। উন্নতমানের কারুকার্যের নিদর্শন এই মন্দিরে দেখা যায়। যোগেশ্বরী গুহা-মন্দিরে (১৮'×১২'×১০') একটি সভাকক্ষ দেখা যায়। যেটির চারপাশে উন্নতমানের কারুকার্যের নিদর্শন দেখা গেছে। সভাকক্ষটি দুটি পিলার ও প্লাস্টার দ্বারা নির্মিত বলে জানা যায়। এই মন্দিরে দেওয়ালে শিব ও বুদ্ধ-মূর্তিরও নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে দেখভালের অভাবে তাও বিলুপ্তির পথে। নটরাজের (মহাদেব) মূর্তিও এই গুহাগাত্রে আজও লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, এই গুহার চারপাশে খোদাই করা দরজাও রয়েছে। যা পাথরের কারুকার্যের উজ্জ্বল নির্দশন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই যোগেশ্বরী মন্দিরেরও চারপাশে আবর্জনার নরক গজিয়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে কমিটি এই বিষয়ে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কমিটির অনুসন্ধানে দেখা যায় ওই সমস্ত এলাকায় বসবাসকারীদের বেশিরভাগই অবৈধভাবে বসবাসও করছে সেখানে। পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদের কাউকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মহাকালী মন্দিরের অবস্থাও এক সময় এমনই ছিল। যোগেশ্বরী মন্দিরের মতোই দুর্দশাগ্রস্ত। গুহা-মন্দিরের অপব্যবহারেও পিছপা হয়নি স্থানীয় বাসিন্দারা। মহাকালী মন্দির গুহার নামটি অবশ্য স্থানীয় মানুষদেরই দেওয়া।

পরবর্তীতে বুদ্ধদেবের মূর্তিও বসানো হয়। কালীমন্দিরের মধ্যেই ১৯টি ছোটো বড় গুহা রয়েছে। যার মধ্যে আছে ভিয়ার্স, চৈত্য প্রভৃতি গুহা। বুদ্ধ ও কালীর উভয় মূর্তিই পাথরের ওপর যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খোদাই করা। এই ধরনের বুদ্ধমূর্তি কানহেরীতেও দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে শিবরাত্রির দিন দর্শনার্থী ও ভক্তদের ভিড় জমে। বোরিভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের থানে গেজেটেও কালো পাথরের এই গুহার বর্ণনা রয়েছে। কানহেরী গুহার কারুকার্যও কোনও অংশে কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। কালো পাথরের গায়ে চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য আজও দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। কানহেরীর গুহা খৃস্টপূর্বের প্রথম শতকে তৈরি বলে জানা যায়। ৯০-এর দশক পর্যন্ত এই গুহার গায়ে বিভিন্ন কারুকাজ করা হয়। কৃষ্ণনগরী শব্দ থেকে কানহেরী শব্দটি আসে বলে অনেকের অনুমান। এক সময় এই গুহার মধ্যে ভাষণকক্ষ থেকে চিকিৎসালয় পর্যন্ত ছিল। গুহাগুলির আকার -আয়তন এতটাই দীর্ঘ যে, মাইলজুড়ে পর পর প্রায় একশ গুহার অবস্থান। একটি গুহাতে জল যোগানের ব্যবস্থা করলে তা সবকটিতেই পৌঁছে যায়। থানা গেজেটে গুহার রাস্তাগুলিকে 'গোলক ধাঁধা' রাস্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কানহেরী গুহার ভিতরের গঠনও অভূতপূর্ব। বড় বড় সিঁড়িগুলি গুহার প্রবেশদ্বার থেকে ভিতরে পৌঁছে যাচ্ছে। বড় বড় জল রাখার পাত্র ও পাথরের খোদাই করা হ্যান্ডেলসহ দরজা-জানালার সৌন্দর্যও বেশ রোমাঞ্চকর। থানা গেজেটে কানহেরী গুহাকে পশ্চিম ভারতের সব থেকে বেশি পাথর কেটে তৈরি মঠ বিশেষ। কি ছিল না এই গুহায়। জল সাপ্লাইয়ের অত্যাধুনিক সুবিধা থেকে ডাইনিং হল পর্যন্ত কানহেরী গুহায় দেখা যায়। হিন্দু শিল্পীদের হাতে এটি নির্মিত। জানালা-দরজার উপযুক্ত ব্যবস্থাও এই গুহাগুলিতে নজরে আসে।

মণ্ডোপেশ্বর গুহাও একটি উজ্জ্বল গুহা মন্দির। একটি বড় পাথরের টিলা থেকে এটি গঠন হয় বলে জানা যায়। ১৬০০ খৃস্টাব্দে এটি নির্মাণ করা হয় বলে অনুমান। এক সময় এই গুহার ধার দিয়ে দহিসার নদী প্রবাহমান ছিল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুহার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি যথেষ্ট স্বচ্ছ রেখেছে। মণ্ডোপেশ্বর গুহা-মন্দির প্রকৃতপক্ষে বাবা মহাদেবের মন্দির।

খৃস্টান ও পর্তুগীজদের নিশানারই সর্বাধিক শিকার হয়েছে মুম্বাইয়ের গুহামন্দিরগুলি। এখানকার কানহেরী মন্দিরগাত্রের পাশে আজও খৃস্ট ধর্মের প্রতীক ক্রশ চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

আরব সাগরের তীরে গড়ে ওঠা মুম্বাই নগরীর একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রাচীন গুহা। হিন্দুদের হাতেই গড়ে ওঠে এই সব। পাথর কেটে বানানো এক একটি গুহা বহিঃআক্রমণের মুখে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, কালের প্রবাহে একেবারে হারিয়ে যায়নি। কমিটির তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রকাশিত হবে ৯ নভেম্বর '০৯
স্বস্তিকা
আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
এখনও মাওবাদীদের রমরমা জঙ্গলমহলে। একদিকে গামছা মাথায় কিষেণজী, অন্যদিকে যৌথবাহিনী – মাঝখানে নিরন্ন মানুষের মুখ। আর সরকার? এখানেও আমরা ওরা – এসব নিয়েই মাওবাদী বিষয়ক বিশেষ বিষয়।
।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com